উপসংহার

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম চারটি গ্রন্থের (৫ম গ্রন্থ *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*-এর ৫টি গল্পের আলোচনা এ অধ্যায়ের পরে সংযুক্ত হয়েছে।) আঠারোটি গল্প পাঠ করলে আমরা উপলব্ধি করি, কাললগ্ন মানুষের স্মৃতিকাতরতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, ক্ষুধা ও স্বার্থপরতা, তাদের সংগ্রাম ও জেগে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। তাঁর গল্পের বিষয়ের কালসীমা ভারত বিভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশককে স্পর্শ করেছে। তাঁর গল্পে রয়েছে তাঁর জীবনোপলব্ধির ক্রমিক অগ্রগতি। *অন্য ঘরে অন্য স্বর* এবং *খোঁয়ারি* গ্রন্থ দুটিতে দেখি জীবনের প্রতি ইলিয়াসের নেতি-দৃষ্টি; জীবনকে দেখার ক্ষেত্রে লেখকের নঞর্থক মনোভঙ্গির কারণে, মনে হয় জীবনের প্রতি তাঁর কোনো ভালোবাসা নেই। কিন্তু মায়া-মমতাহীন, পূতিগন্ধময় কাদার মতো, মানুষে-কুকুরে, স্বার্থপরতায়-সংঘাতে বৈচিত্র্যহীন সাদা যে জীবনকে তিনি দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, তা ভয়ানক সত্য, বাস্তব। সেখানে মিথ্যে-মেকি-অতিকথনের প্রশ্রয় নেই। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় স্মৃতি খুঁজে খুঁজে রঞ্জুর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া, 'উৎসব'-এ ধানমন্ডির জৌলুশপূর্ণ বৌভাতের পাশাপাশি পুরান ঢাকার মানুষ-কুকুরের সম্মিলিত সহাবস্থান, 'প্রতিশোধ'-এ আবুল হাশেম ও আনিসের ভণ্ডামি, ওসমানের সীমাহীন ব্যর্থতা, 'যোগাযোগ'-এ মৃত্যুপথযাত্রী, ব্যথায় কাতর সন্তানের সামনে মায়ের অসহায়ত্ব, 'ফেরারী'তে রুদ্ধশ্বাস জীবন থেকে হানিফের পলায়ন, 'অন্য ঘরে অন্য স্বর'-এ বর্তমান-বিচ্ছিন্ন পিসীমা, নিরাপত্তাহীন জীবনে দেশ ছেড়ে বৌদির কলকাতা যাওয়ার বাসনা, 'খোঁয়ারি'তে রিক্ত মদ্যপ সমরজিতের বাবার নিরন্তর কাশি, রাজনীতির নামে জোরদখল, 'অসুখ-বিসুখ'-এ জটিল রোগের মধ্যে অবহেলিত বৃদ্ধা আতমন্নেসার স্বস্তি লাভ, 'তারা বিবির মরদ পোলা'য় সন্দেহপ্রবণ তারাবিবির অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব,

'পিতৃবিয়োগ'-এ মৃত্যুর পর পিতার দুই ধরনের পরিচয়ে দিশেহারা ইয়াকুবের পলায়ন—প্রথম দুই গ্রন্থের এই দশটি গল্পের মধ্যে কোথাও আশার কথা নেই, জীবনের মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত নেই। জীবনকে যে ভয়াবহ রূপের মধ্যে ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন, তাকে নির্বিকারভাবে অবিকল উপস্থাপন করেছেন, কোথাও তার হাত টলেনি এতটুকু।

তৃতীয় এবং চতুর্থ গ্রন্থেও জীবনের রূঢ় ও বাস্তব দিকগুলো উপস্থিত, কিন্তু এই রূঢ়-কর্দমাক্ত-বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোথাও জীবনের মহৎ সম্ভাবনাও যে নিহিত রয়েছে, পাশাপাশি ইলিয়াস তাকেও উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। *দুধভাতে উৎপাত* গ্রন্থে আরেকটি পরিবর্তন এসেছে লেখকের মধ্যে, তিনি নগর থেকে গ্রামের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন ঢাকা বা চট্টগ্রাম মহানগরই বাংলাদেশ নয়, সুবিস্তৃত গ্রাম-জনপদের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের মানুষের শিকড় আর তাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম। আবার গ্রাম-পটভূমির প্রথম গল্পেই ('দুধভাতে উৎপাত') তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, গ্রামের মানুষ কতটা নিঃস্ব, ক্ষুধা সেখানে কতটা সর্বগ্রাসী; দেখিয়েছেন, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ কতটা স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও গ্রামেই ইলিয়াস প্রথম উপলব্ধি করেছেন মানুষের সংগ্রাম ও অমিত সম্ভাবনা। 'দখল' গল্পে (*দুধভাতে উৎপাত*) অস্তিত্বের প্রশ্নে সেই সংঘবদ্ধতা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। অবশ্য শহর-পটভূমি নিয়ে লেখা 'মিলির হাতে স্টেনগান' গল্পে আব্বাস পাগলাকে মিলির স্টেনগান দেওয়ার মধ্যে মানুষের ফিরে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। 'দুধভাতে উৎপাত' গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী জয়নাব বিবির 'বুইড়া মরদটা! কী দ্যাহস? গোরু লইয়া যায়, খাড়াইয়া খাড়াইয়া কী দ্যাহস? ['—অহিদুল্লার প্রতি এই নির্দেশের মধ্যেই তার প্রতিরোধস্পৃহা আভাসিত। 'পায়ের নিচে জল'-এ মূর্ত হয়েছে জমির মালিক শহুরে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যস্বত্বভোগী মহাজন কর্তৃক নিঃস্ব কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে শ্রেণীসংগ্রামের ইঙ্গিত, লেখকের চূড়ান্ত আশাবাদ, নেতি-দৃষ্টি থেকে ইতি-দৃষ্টিতে লেখকের জীবনোপলব্ধির উত্তরণ।

দোজখের ওম গ্রন্থের 'কীটনাশকের কীর্তি'তে একদিকে রয়েছে মহাজনের শোষণ, মহাজনের টাউট সন্তানের হাতে নিগৃহীত হয়ে রমিজের বোনের আত্মহত্যা, অন্যদিকে শহুরে সাহেব-বিবি-সন্তানের বিলাসী জীবনযাপন। সাহেবের মেয়েকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করার জন্য রমিজের যে প্রচেষ্টা, তাতে রয়েছে সমস্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রমিজের অসহায় প্রতিবাদের ইঙ্গিত, 'যুগলবন্দি'তে শহুরে সাহেব-বিবির বিলাসী জীবনযাপনের

পাশাপাশি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মতো জীবনযাপনের জন্য শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত আসগরের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে উভয় শ্রেণীর মানুষের জীবন ও স্বপ্নাকাঙ্ক্ষাকে লেখক উপলব্ধি করেছেন। 'দুধভাতে উৎপাত' থেকে আমরা মানুষের যে মহত্ত্ব আবিষ্কার করতে শুরু করেছি, সেই মহত্ত্ব দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা 'অপঘাত'-এ *(দোজখের ওম)* শহীদ মুক্তিযোদ্ধা বুলুর বাবা মোবারকের নবচেতনায়; 'রেইনকোট'-এ (পরের *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*-এ গ্রন্থিত) যুদ্ধের গৌরবে মিলিটারির নির্যাতনের প্রতি নূরুল হুদার উদাসীনতায়। 'দোজখের ওম' গল্পে নিশ্চল কামালউদ্দিনের জেগে ওঠার মধ্য দিয়ে লেখক উপলব্ধি করেছেন একটুকরো ভালোবাসার জন্য মৃত্যুর গহ্বর থেকে মানুষের বেঁচে ওঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে।

শুরুতে ইলিয়াস মানুষের মধ্যে মহৎ কিছুই দেখেনি। প্রেম, দেশের মাটির জন্য ভালোবাসা, জীবনকে উৎসর্গ করা—এসব মানবিক গুণ ও প্রবণতা তিনি এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে 'দোজখের ওম' পর্যন্ত পাঠপরিভ্রমণ শেষে ইলিয়াসের কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই জীবনের জয়গান। তিনি হতাশা থেকে আশায়, অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, গরল থেকে অমৃতে উপনীত হতে চেয়েছেন। তিনি মানুষের গভীর গভীরতর সংকট-সমস্যাকে যেমন উপলব্ধি করেছেন, তেমনি উপলব্ধি করেছেন সেসব থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে মানুষের আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে। তাঁর এই উপলব্ধির উৎস অবশ্যই বহুস্তরবিশিষ্ট মানুষের জীবন—মানুষের জীবনকে তিনি বাইরে থেকে না দেখে ভেতর থেকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন, গল্পে সেই জীবনের অতিরঞ্জনে তাঁর বিশ্বাস নেই, নেই বলেই তিনি বহুচর্চিত প্রেম-ভালোবাসার সস্তা আখ্যানকে স্বপ্নময় করে তোলেননি; জীবনকে জীবনময় করে তুলেছেন তাকে অবিকল রূপের ভেতরে দেখে, যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি ও উদ্‌ঘাটন করে। এভাবে ইলিয়াসের জীবনোপলব্ধি পেতে চেয়েছে গভীরতা ও সম্পূর্ণতা। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বসবাস করছেন কালের মধ্যে, তাঁর চরিত্রেরা নানাভাবে সেই কালের সঙ্গে লগ্ন। কালের মধ্যে বসবাস ও কালকে ধারণ করলেও তাঁর গল্পে কালোত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে।

সংযোজন

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল : স্বপ্নভঙ্গের গল্প

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তিন দশকের চেয়ে বেশি সময় লেখালেখি করেছেন, সময়ের তুলনায় তাঁর লেখার পরিমাণ অল্প : অনধিক ৩২/৩৩টি গল্প, দুটি উপন্যাস ও একটি প্রবন্ধসংকলন। ২০১১ সালে বেরিয়েছে তাঁর সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত ডায়েরি ও স্কুলপাঠ্য রচনার একটি সংকলন। কম লিখতেন কিন্তু পছন্দ করতেন দীর্ঘ রচনার জন্ম দিতে। উপন্যাস দুটি *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) ও *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) এক কথায় বিশালায়তন রচনা; অধিকাংশ ছোটগল্প আজকাল বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত বহুল পঠিত ও কথিত উপন্যাসমালার চেয়ে আকৃতিতে বড়, প্রকৃতিতে গভীর।

আয়তনের বিশালত্ব এবং জীবনের দগদগে ঘাকে নির্মম-নিস্পৃহভাবে উপস্থাপনের সুবাদে শুরু থেকেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রচনা খুব কমসংখ্যক পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছে। তা সত্ত্বেও ইলিয়াস কখনো কোনো দিক থেকেই আপস করেননি; কারণ, পাঠককে তিনি ভালোবাসতেন, তাদের ঠকাতে চাইতেন না।

অধিকাংশ বাঙালি পাঠক আদর করেন সে কাহিনিকে, যা তাদের জীবনে নেই, কিন্তু যা তারা স্বপ্নে দেখতে ভালোবাসেন। এগুলো হলো ইচ্ছাপূরণের গল্প বা স্বপ্নের গল্প। মানবেতর জীবন যাপন করে যে মানুষ, তাকে ভুল স্বপ্ন দেখানো অপরাধ বলে মনে করতেন ইলিয়াস। তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থের নাম রেখেছেন *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭)। গল্পগুলো স্বপ্নভঙ্গের। বইটির ভেতরে প্রবেশ করার আগে গল্পগুলোর গ্রন্থনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা লিখে নিতে চাই।

চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *দোজখের ওম* (১৯৮৯)[৪] প্রকাশের পর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সহসা আর কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করতে চাননি—এ কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁর হাতে প্রায় দশটি গল্প ছিল : *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল-*

এ গ্রন্থিত পাঁচটি এবং প্রথম দিকের রচনা 'অতন্দ্র', 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ' ইত্যাদি। 'অতন্দ্র', 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' ও 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ'-জাতীয় গল্প 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'কে তিনি প্রথম গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘর অন্য স্বর*-এর (১৯৭৬) শুরুতে স্থান দিয়েছিলেন। এ ধরনের গল্প রচনায় ষাটের দশকের গল্প লেখকেরা খুব উৎসাহী ছিলেন; জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের (১৯৩৯) *দুর্বিনীত কাল* (১৯৬৫) ও *বহেনা সুবাতাস* (১৯৬৭) পাঠ করলে তা বোঝা যাবে; আবদুল মান্নান সৈয়দের *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮) ও আরও বেশ কিছু গল্পে এর প্রমাণ মিলবে। পরে ইলিয়াস মধ্যবিত্তের মনোজটিলতা ও মনোবাস্তবতাকেন্দ্রিক গল্পের এই জগৎ থেকে সরে আসেন।

বিলম্বে প্রকাশিত প্রথম গল্পগ্রন্থে ইলিয়াস 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'কে স্থান দিয়েছিলেন, ধারণা করি এই ভেবে যে, তাতে তাঁর ওই-জাতীয় একটি গল্পের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় থাকবে। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' যে একটি সেরা গল্প তা-ও নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন তিনি।

মধ্যবিত্ত নর-নারীর মানসিক জটিলতা আরেকবার জোরালোভাবে স্থান পায় ১৯৭৯ সালে লেখা 'প্রেমের গপ্পো' গল্পে, কিন্তু সেখানে পরিবর্তিত ইলিয়াসের প্রবণতা, বিশেষত সিরিয়াস বিষয়ে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা সহজলভ্য। আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ইলিয়াস তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস *খোয়াবনামা* (১৯৯৬) লিখছিলেন, খুব বেশি মনোযোগ ছিল এ উপন্যাসের দিকে। এ সময় গল্পের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। নিজে অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে 'প্রেমের গপ্পো' ও 'ফোঁড়া' তিনি *দোজখের ওম*-এ রাখেননি। বাকি থাকে তিনটি গল্প : 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল', 'কান্না' ও 'রেইনকোট'। অর্থাৎ একটি বইয়ের জন্য সন্তুষ্ট হওয়ার মতো গল্প ইলিয়াসের হাতে ছিল না। তবু মৃত্যুর (৪ জানুয়ারি ১৯৯৭) আগে তিনি *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* গ্রন্থের পরিকল্পনা করে যান। অনিশ্চয়তা, প্রকাশকের তাগাদা আর প্রিয়জনদের প্রেরণা—এগুলো একটি বা দুটি বা তিনটিই এর কারণ হতে পারে। গল্পের ওপর বারবার কলম চালিয়ে তাকে পরিণতি দেওয়া ইলিয়াসের স্বভাব ছিল, কিন্তু সে সময় ইলিয়াস পাননি, ধারণা করি, উপন্যাসে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে। অন্য কোনো কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। এভাবে, এ গ্রন্থের গল্পগুলো অন্যান্য গ্রন্থের গল্পগুলোর মতো লেখকের যথেষ্ট মনোযোগ পায়নি। ফলে তাঁর আগের চারটি গ্রন্থের অধিকাংশ গল্প যে গভীরতা, ব্যাপ্তিতে ও শিল্পকুশলতায় পাঠকের আকাঙ্ক্ষার চূড়া স্পর্শ করে—এ গ্রন্থের গল্পগুলো কোনো না কোনো কারণে ততটা করে না।

'প্রেমের গপ্পো' আমাদের প্রত্যাশার চূড়াস্পর্শী না হলেও ইলিয়াসের গল্পগুলোর মধ্যে এর কিছু তাৎপর্য আছে। ইলিয়াস জীবনের অন্যতর অর্থ উপলব্ধি করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত তরুণ-তরুণী, স্বামী-স্ত্রীর নানাবিধ মনোজটিলতা ও দ্বন্দ্বকে বিষয় হিসেবে বর্জন করেছিলেন। নিজস্ব পথ অনুসন্ধানের কারণেও হয়তো তাঁকে এটা করতে হয়েছিল। এ-জাতীয় গল্প বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে আজতক প্রচুর লেখা হয়েছে। এ রকম গল্প লিখতে গেলে কেমন স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব চলে আসে বলে ইলিয়াস মনে করতেন। তা সত্ত্বেও ইলিয়াস আশির দশকের উপান্তে 'প্রেমের গপ্পো' লেখেন, কিন্তু নামকরণেই বোঝা যায় স্যাঁতসেঁতে ভাবটি এ গল্পে থাকবে না। বস্তুত এটা কোনো প্রেমের গল্পই নয়। অন্য কোনো তেলতেলে লেখকের হাতে পড়লে হয়তো এটি প্রেমের গল্প হয়ে উঠত।

ঢাকার ছেলে জাহাঙ্গীর কুমিল্লার মেয়ে বুলাকে বিয়ের অনতিকাল পরই প্রায় প্রতিদিন সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে বিয়ের আগেকার নিজের গল্প বলে। গল্পগুলো অনেকটা বাংলা সিনেমার মতো। 'বাংলা সিনেমার মতো' কথাটির অনেক অর্থ। তার একটি হলো নায়ক আলটপকা বাহাদুরি দেখিয়ে নায়িকাকে টাসকি খাইয়ে দেবে। এ গল্পে থাকে কোনো মেয়ের কাছে জাহাঙ্গীরের বাহাদুরির সাজানো বয়ান। প্রকৃতপক্ষে অক্ষম মানুষদের একধরনের হীনম্মন্যতা থাকে, এ হীনম্মন্যতা থেকে অন্তত ঘরের বউয়ের কাছে নিজের নানা যোগ্যতাকে জাহির করার একটা প্রবণতা এ ধরনের মানুষকে পেয়ে বসে।

বুলার ভাই হাফিজের সঙ্গে একদিন মুশতাক আসে, কুমিল্লায় যার সঙ্গে বুলা সুনীল দার কাছে গান শিখত। দেখা যায় গান সম্পর্কে মুশতাক-বুলার ধারণা আর জাহাঙ্গীরের ধারণা মেরুদূরত্বে; বুলার সামনে বাহাদুর সেজে থাকা জাহাঙ্গীরকে মেহমানদারির নাম করে উঠে পড়তে হয়, আর সে কোনো দিশা পায় না এসব ভেবে যে :

> এই ব্যাপারে (গান) তার সঙ্গী আছে একজন, সে আবার তার ভায়ের বন্ধু—বুলা তো কোনোদিন বলেনি। কেন বলেনি? (পৃ-১৫)

কিংবা :

> কে এই সুনীল দা, যার শারীরিক অসুস্থতার খবরে বুলা এখানে ভেঙে পড়ে। (পৃ-১৫)

প্রশ্নগুলোর উত্তরহীনতায় যে মেয়েটাকে এতক্ষণ নিজের হাত-পা-নাক-কানের মতো মনে হচ্ছিল, তার সম্পর্কেই প্রশ্ন জেগে ওঠে মনে, তাকে 'এখন এত অপরিচিত মনে হচ্ছে কেন?'

টিভির ওপর চটা, সিরিয়াস সিনিয়র আর্টিস্ট মুশতাকের প্রশংসা করে বুলা স্বামীর কাছে, কিন্তু এ ধরনের হাই-থটের গান বাজনা করা লোকের সঙ্গে বুলার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল—এ মন্তব্যের উত্তরে বুলার বক্তব্য আকর্ষণীয় :

> ঐসব লোক গুণীলোক, ওদের খুব শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ওদের ভালোবাসা মুশকিল। বুঝলে না, রাতদিন বিছানার ওপর বসে খালি রেওয়াজ করে, বাইরে যায় না—এসব পুরুষ মানুষের সঙ্গে ঘর করা যায়? (পৃ-১৭)।

বুলা বিয়ের আগে কাউকে ভালোবাসত বা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিয়েতে তার সম্মতি ছিল না—এমন কোনো ইঙ্গিত গল্পে পাওয়া যায় না। অতএব কেবল স্বামীকে খুশি করার জন্যই বুলা এ কথা বলেনি : 'এই রকম হাসিখুশি, এই রকম কাজের লোক, এই রকম ফিগার, হেঁটে গেলে মাটি কাঁপে'—অর্থাৎ জাহাঙ্গীরকে পেয়ে সে খুশিই হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের অব্যবহিত পর জাহাঙ্গীরকে যতটা সরল ভেবেছে বুলা, ততটা সরল সে ছিল না। দুজন অসম মানসিকতার নর-নারীর মিলন যে কতটা ভয়ানক হতে পারে, ইলিয়াস তা উপলব্ধি করেছেন। গল্পের উপান্তে দেখা যায়, বিয়ের ২০/২২ দিনের মাথায় বুলা ও জাহাঙ্গীরের মানসিক ব্যবধান এতই প্রকট হয়ে ওঠে যে, সেমি-ডবল খাটে দুজনের ঘুমানো খুব বিশ্রী লাগে জাহাঙ্গীরের।

আসলে মুশতাকের আগমনের পর জাহাঙ্গীরের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা চাপা থাকে না। শুরুতে মিথ্যে গল্প বললেও তার মধ্যে যে সারল্য ছিল, মুশতাকের আগমনের পর সে জায়গা দখল করে জটিলতা, তার মধ্যে তৈরি হয় বুলাকে আঘাত করার স্পৃহা। ফলে একই গল্পে পরশু যেখানে একটা মেয়ে তাকে 'জাহাঙ্গীর ভাই' ও 'আপনি' সম্বোধন করছিল, সে গল্প আজ পুনর্বার বলতে গেলে, দেখা যাচ্ছে, সে মেয়ে, যে পুলিশ হয়েছে, তাকে 'জাহাঙ্গীর' এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করছে। আগেরবার এ গল্পে মেয়েটিকে সে মোটরবাইকে নেয়নি, এবার বলার সময় দেখা যাচ্ছে, মেয়েটা তার বাইকের পেছনে শুধু উঠেই বসেনি, তাকে জাপটেও ধরেছে।

লক্ষণীয়, বুলার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ, জাহাঙ্গীর বারবার বলা কোনো গল্পের ভুল কোনো নাম বা ঘটনা বললে, বুলা ধরিয়ে দিত মমতায়; কারণ, এ গল্পগুলোর মধ্যে মিথ্যের প্রলেপ থাকলেও সেই মিথ্যের পেছনে কোনো সচেতন উদ্দেশ্য ছিল না; ছিল সহজ আনন্দপ্রাপ্তির সাধারণ স্পৃহা। কিন্তু মুশতাকের আগমন এবং সুনীল দা ও গান প্রসঙ্গে আলোচনার পর জাহাঙ্গীর উদ্দেশ্যমূলকভাবে সূক্ষ্ম চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছে; বুলাকে মানসিকভাবে আহত করে বিকৃত আনন্দ পেতে চেয়েছে। বুলাও বিষয়টি বুঝেছে এবং জাহাঙ্গীরের

ভুল শুধরে দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করেনি। কারণ, বুলা জাহাঙ্গীরের মধ্যে আবিষ্কার করেছে সারল্যের বদলে প্রতিহিংসা, এমনকি বিকৃতিও। এই বানানো গল্পের অনতিকাল পরই জাহাঙ্গীরের আঘাতে বুলা কতটা আহত হয়েছে, তা বোঝার জন্য জাহাঙ্গীর আলো জ্বালাতে সুইচে হাত দেওয়ার আগেই মিহি স্বর শুনে বুঝতে পারে, বুলা ঘুমিয়ে পড়েছে। বুলার এই ঘুম জাহাঙ্গীরের সরব আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় নীরব প্রতিশোধ।

ইলিয়াস কি বুলার বিপরীতে জাহাঙ্গীরকে স্বার্থপর ও খারাপ মানুষরূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন? আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। বস্তুত ইলিয়াসের দৃষ্টি সেখানে নয়, এখানে কেউই খারাপ নয়, ভালো-খারাপের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। ইলিয়াস দেখিয়েছেন অসম মানসিকতার দুজন মানুষকে, যাদের দুঃখ ও বেদনার রং মূলত একই। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা বুলা ও জাহাঙ্গীরের রুচি ও মানসিকতা সংগত কারণেই ভিন্ন হয়েছে। কেউ চায়নি, তবু এই ভিন্নতা দুজন মানুষের মাঝখানে গড়ে তুলেছে অনতিক্রম্য দেয়াল—বিষয়টি ইলিয়াস তুলে ধরেছেন বলে দুজনেই পাঠকের সমবেদনা লাভ করে।

১৯৭৯ সালে এ ধরনের গল্প ইলিয়াসের হাতে আকস্মিক। জাহাঙ্গীর চরিত্রটিকে ইলিয়াস যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে কোথাও কোথাও অতিকথন চোখে পড়ে। গল্পের মধ্য-অংশে যেতে যেতেই জাহাঙ্গীরের মিথ্যে গল্পের বিষয়টি পাঠকের জানা হয়ে যায়, অথচ এর পরও লেখক ব্যাপারটিকে বারবার খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন :

১. এই গল্পের আগেকার ভার্সনে কিন্তু জাহাঙ্গীরের সঙ্গে হিপ-হিপের এতটা মাখামাখি বা পিকনিক এইসব ব্যাপার ছিল না। (৭-১৮)
২. জাহাঙ্গীরের কথায় এ ধরনের ঝাঁঝ আগে কখনো দেখেনি। (পৃ-১৮)
৩. অবশ্য কলেজে পড়তে কোনো মেয়ের সঙ্গেই জাহাঙ্গীরের কথাবার্তা হয়নি। না হিপ-হিপের সঙ্গেও হয়নি। (পৃ-২০)

এভাবে, বুলাকে বলা জাহাঙ্গীরের প্রাক-বিবাহকালের গল্প মিথ্যের প্রলেপ লাগানো, মিথ্যে, এসব অনেক আগে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও ইলিয়াস ক্রমাগত বিষয়টি নিয়ে বাক্য ব্যয় করতে থাকেন, যা এ গল্পের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে।

বাংলাদেশে বড় বড় আন্দোলন-সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে, তাতে কখনো কখনো আপাত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হলেও সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তারা যে তিমিরে ছিল, ঘুরেফিরে সে তিমিরেই থেকে গেছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে

ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন যে, এ দেশের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন স্বার্থপরতা, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, আর আন্তরিকতার অভাব। ইলিয়াসের এ উপলব্ধি 'ফোঁড়া' গল্পেও উপস্থাপিত হয়েছে।

এ গল্পের সপ্তম পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠকের বোঝার অবকাশ থাকে না যে, ইলিয়াস মূলত কোন চরিত্র বা ঘটনার দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। কারখানায় সংঘর্ষে আহত পার্টিকর্মী নঈমুদ্দিনকে হাসপাতালে না পেয়ে ক্ষিপ্ত পার্টিকর্মী মামুন রিকশায় চেপে ফিরে যাচ্ছে বাসায়। রিকশাঅলা নঈমুদ্দিনের আত্মীয়, এ কথা জানার পর নঈমুদ্দিনের ওপর মামুনের যে ক্ষোভ তা রিকশাঅলার ওপর ঝাড়া যাবে, এ কথা ভাবতে ভাবতে দেখা যায় রিকশাঅলা নিজেই তার নিজের সমস্যার কথা বলতে শুরু করেছে। রিকশাঅলা তার একটা ফোঁড়ার কথা বলতে বলতে এসে পড়ে তার বউ, ছেলেমেয়ে ও টাকা ধার করার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গ—তাতে ধীরে ধীরে হাসপাতালত্যাগী নঈমুদ্দিন, পার্টি, মামুনের দায়িত্ব, তার ক্ষোভ—এসব প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়, মামুনের কৌতূহলের কেন্দ্রে চলে আসে রিকশাঅলা।

রিকশাঅলার মধ্য দিয়ে এই শ্রেণীর মানুষের কিছু প্রবণতা তুলে ধরেন লেখক। যে রিকশাঅলা বলে: 'ব্যাটা-বিটি হামার বায়না ধরিছে, ভাত খামো। হামাগো বাঙালি জাতের এই এক দোষ।' সে নিজেই ৮ দিনে ১০ টাকা সুদে মহাজনের কাছ থেকে ৩০ টাকা ধার নিয়ে প্রথমেই কেনে দুই সের চাল। কেনাকাটা শেষে এক টাকা রাখে ভিক্ষা দিতে। কারণ, 'ঈদের দিন ফকির-ফাকরাক ভিক্ষা দেয়া লাগে না?' ছোটখাটো ঘটনা ও সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ও প্রবণতাকে স্পষ্ট করেছেন লেখক।

শ্রমিকদের জন্য রাজনীতি করা মধ্যবিত্ত মামুনরা প্রকৃতপক্ষে না তাদের সঙ্গে মিশতে পারে, না তাদের জীবনের বঞ্চনা-বোকামি-অসুস্থতাকে ঘৃণাহীন গ্রহণ করতে পারে। মামুন ও তার দল কারখানায় শ্রমিক সংঘর্ষে আহত নঈমুদ্দিনকে ব্যবহার করে ফায়দা পেতে চায়। এখানে একপক্ষে মামুন, অন্যপক্ষে নঈমুদ্দিন, মাঝখানে রিকশাঅলাকে লেখক উপস্থিত করেছেন প্রতীক হিসেবে। মামুন রিকশাঅলার গল্প শুনতে শুনতে সময়টা কাটায়, ভুলে যায় নঈমুদ্দিনের কথা। রান্না করতে গিয়ে সেমাইকে আটার দলায় পরিণত করেছে বলে রিকশাঅলা বউকে সেই আটার দলা খাইয়েছে রাতে, মাথায় একটা ঠোনাও মেরেছে। বউয়ের সঙ্গে রিকশাঅলার এ ধরনের ব্যবহার মামুন অনুমোদন করে না, 'ওরা বাপ ছেলে মেয়ে কৈ মাছ দিয়ে ভাত খেল আর বউকে খেতে হলো আটার দলা, এসব কি?' এটা হলো মামুনের শিক্ষিত

মধ্যবিত্তসুলভ মূল্যবোধ। রিকশাঅলার ওই ফোঁড়ারূপ জীবনের থকথকে অন্ধকার ও সমাধানহীন দুঃখ মামুনের মতো লোকের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, বোঝাও সম্ভব নয় সেই অন্ধকারের বেদনা। তাই রিকশাঅলার গোপন অঙ্গের কাছাকাছি পুঁজ-রক্ত-গন্ধময় বীভৎস ফোঁড়া দেখার যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে লাফ দিয়ে রিকশা থেকে নেমে বাড়ির দিকে পালাতে হয় মামুনকে। শুধু ফোঁড়া-দৃশ্য থেকে পালায় না সে, পালায় অন্ধকার জীবন থেকেও। যদিও মানুষকে এই জীবন থেকে উন্নততর জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে কারখানায় শ্রমিকদের আর বক্তৃতার মঞ্চে।

মামুন যে রাজনীতি করে সে রাজনীতির প্রতি তার নিজেরই কোনো বিশ্বাস নেই। সরকার এবং মিলিটারির লোক (তখন দেশে চলছে সামরিক শাসন) নবীন বঙ্গ শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিকদের মূল দাবি-দাওয়াকেন্দ্রিক আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে চায়, শ্রমিকদের মাথা ফাটায়। কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে যারা কথা বলছে সেই দলের প্রতি, সেই আদর্শের প্রতি মামুনের যেমন কোনো শ্রদ্ধা আছে বলে মনে হয় না, সংগত কারণে, ইলিয়াস দেখিয়ে দেন, এ দেশে তাদের রাজনীতি কতটা ব্যর্থ। কারখানায় মারামারিতে যারা আহত হয়েছে, তাদের অনেককেই টাকাপয়সা দিয়ে সরকারের নবীন বঙ্গ শ্রমিক সংঘ নিজেদের করে নিয়েছে। নঈমুদ্দিনের দায়িত্ব মামুনের ওপর, আবার তার বউকে যাতে প্ররোচনা দেওয়া সম্ভব না হয়, সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্টির এক মহিলা কর্মীর ওপর। এ প্রসঙ্গে মামুনের যে ভাবনা তাতেই ওই কর্মীর এবং ওই পার্টির যাবতীয় অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়ে :

> বৌটাকে ঠিক রাখার দায়িত্ব পার্টির যে মহিলার ওপর অর্পিত তার কাজের কোনো লেখা জোকা নাই। একটা কিন্ডার গার্টেন চালায়, গানের স্কুলের প্রধান, সেলাই শেখায়, আবার মহিলা সমিতির মিটিংগুলোর ব্যবস্থা করতে হয় তাকেই। তার ওপর কতটা ভরসা করা যায়। (পৃ-২৭)

ভরসা শুধু যে মহিলাকর্মী বা মামুনের ওপর রাখা যায় না তা নয়, ভরসা রাখা যায় না শ্রমিক নঈমুদ্দিনের ওপর, এমনকি তার বউয়ের ওপরও। চিকিৎসার জন্য দেওয়া এক শ টাকা নিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় নঈমুদ্দিন চলে যায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে ঈদ করতে। তার শারীরিক অবস্থা খারাপ, তার চেয়ে বাড়িতে গিয়ে যদি অন্যপক্ষ থেকে টাকা নিয়ে এ পার্টির সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করে—এ সন্দেহই মামুনকে কাবু করে বেশি। এভাবে কেবল একপক্ষের নয়, সব পক্ষের সব ধরনের চরিত্রের মুখোশ ইলিয়াস খুলে দেন পরিহাসের ভেতর দিয়ে। কারও জন্য কারও কোনো ব্যথা নেই, তাই

লেখকের ভেতরকার যে ব্যথা থাকে তিনি চাপা দিয়ে তাদের পরস্পরের চোখ দিয়ে তাদের অবস্থান থেকে পরস্পরকে দেখিয়েছেন। এ জন্য খুব স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে লেখক পরিহাস ও ব্যঙ্গ করতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দে।

নঈমুদ্দিনকে দেখতে গিয়ে আহত এক মোয়াজ্জিনের সঙ্গে পরিচয় হয় মামুনের। তার যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, মামুনের ভাবনার ভেতর দিয়ে তাতে সূক্ষ্ম পরিহাসের পাশাপাশি ওই মোয়াজ্জিনের বাস্তব অবস্থা ও তার প্রকৃতির সবটাই ধরা পড়ে :

> দোকানে যেতে তড়িঘড়ি করতে গিয়ে মসজিদে পানির লাইন নেওয়ার জন্যে খুঁড়ে রাখা গর্তে পড়ে তার ডান পায়ে ফ্রাকচার হয়েছে। গোটা মাসের তারাবি নামাজ ও সুর্মা-আতর-তসবি বেচা—দুই-ই মাটি। পরকাল ও ইহকালের এই লোকসানে লোকটা বড় ভেঙে পড়েছে, রোজগারের মাস বলতে এই একটাই, তার পুরোটাই এবার পণ্ড হলো। নঈমুদ্দিনের প্রসঙ্গ অনেকদিন পর তাকে চাঙ্গা করে তোলে, এই জাহেলগুলির ঈদের সখ একটু বেশি। (পৃ-২৬)

পুরো গল্পে দেখি লেখকের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, রিকশা করে রাস্তা দিয়ে আসার সময় ছোটখাটো কোনো কিছুই চোখ এড়ায় না, মামুনের ভাবনা ও দৃষ্টির মধ্যে আসা কোনো প্রসঙ্গই অবান্তর মনে হয় না।

এভাবে এ গল্পে আমরা আবার পূর্বের ইলিয়াসকে অনেকটা ফিরে পাই, যেখানে তিনি দেখেন, উপলব্ধি করেন কিন্তু অংশগ্রহণ করেন না; যেখানে তাঁর বর্ণনা নিখুঁত, ঋদ্ধ তাঁর সংহতি, ব্যঞ্জনাময় তাঁর প্রতীক। নৈপুণ্যের দিক থেকে 'ফোঁড়া'কে এ গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত সফল গল্প বলা যায়।

মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পর থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট মূলত 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পের পটভূমি। ইলিয়াসের আর দুটি মুক্তিযুদ্ধের গল্প 'অপঘাত' (*দোজখের ওম*) ও 'রেইনকোট'-এর (*জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*) সূচনা ও সমাপ্তি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যেই; মুক্তিযুদ্ধে শুরু হয়ে ৯০ দশকের সূচনাকাল স্পর্শ করেছে বলে 'জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' একটি ভিন্নতর ব্যঞ্জনা পেয়েছে। যুদ্ধের ভেতরে কোনো ব্যক্তির নতুন চেতনায় উত্তরণ নয়, বরং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও মহৎ ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন হওয়া একটি দেশে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরে কত দ্রুত সর্বস্তরে অবক্ষয় নেমে আসে, আরও পরে কীভাবে তা বিস্তৃতি লাভ করে, প্রতিক্রিয়াশীলরা দ্রুত পুনর্বাসিত ও শক্তিশালী হয়ে কীভাবে চারদিকে ডালপালা-শিকড় ছড়িয়ে বসে, তা-ই এ গল্পের মৌল উপজীব্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ত্যাগকে যেমন ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন, তেমনি বরাবরের মতো এখানেও দেখেছেন মানুষের

শঠতা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা ও পশ্চাৎপদতা।

ইসলামের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে রাজাকাররা, তাদের মতে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু 'কালো হলেও দেখতে ভালো' ইমামুদ্দিনের বউকে কোনো ক্যাম্পে খুঁজে না পেয়ে ইমামুদ্দিনের ভাষায় 'মিলিটারির ভাউরা' রাজাকার নাজির আলি ভাবে :

> আমার দীনের জন্য হাজার মাইল দূরে থেকে মিলিটারি এসে জান কোরবান করে দিচ্ছে, তাদের শরীরে তো কিছু চাহিদা থাকে। সেটুকু মেটাতে না পারলে নিমকহারামি হয়ে যায় না? (পৃ-৪৮)

নাজির আলিদের খোলস এভাবে খুলে যায়, তাদের নিষ্ঠুরতা, আদর্শ-উদ্দেশ্যের অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট ও হাস্যকর হয়ে ওঠে।

মুক্তিযুদ্ধের মহত্ত্ব ও মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগকে কোনো দিক থেকে খাটো না করে ইলিয়াস যুদ্ধ-পরবর্তী অরাজকতাকে কৌশলে অল্প কথায় তুলে ধরেন 'খোঁয়ারি'তে যেমন, এ গল্পেও তেমনি। উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি যুদ্ধের পর দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আপাত উত্তরাধিকারবিহীন হার্ডওয়ারের দোকান দখল করে বসে সরকারি দলের এমপি। যুদ্ধশেষে ইমামুদ্দিনকে লন্ড্রিতে চাকরি দিয়ে লালমিয়া গুলিস্তান-নাজে সিনেমা দেখে সবার কাছে সেসব গল্প বলার কথা ভাবত, কার্যত তা হলো না। 'ইমামুদ্দিন বেঁচে থাকলেও বিলাতি বোতল তার হাতে উঠতো কিনা সন্দেহ'—লালমিয়ার এ সন্দেহ যথার্থ। রাংলাবাজারের প্রেসের সাধারণ কর্মচারী ইমামুদ্দিন বিলাতি মদের গল্প বলতে পছন্দ করত, কিন্তু স্বাধীন দেশে বিলাতি বোতল দেখেছি সরকারি দলের কর্মী ফারুক-জাফরদের হাতে ('খোঁয়ারি'), যাদের হুমকির মুখে থাকে সমরজিৎদের বাড়ি (ঐ), যাদের চাঁদা দিতে দিতে ননীদা নিঃশেষিত হতে থাকে, যাদের ভয়ে তার মেয়ে কলেজে যেতে পারে না, যাদের জন্য ননীদারা স্বদেশে হয়ে থাকেন পরবাসী ('অন্য ঘরে অন্য স্বর')।

এ গল্প বর্তমানে শুরু হয়ে পেছনে যায় মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত। মাঝখানের দীর্ঘ ২১ বছরের রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থা কতিপয় মানুষের কর্মকাণ্ড ও ভাবনার মধ্যে উপস্থিতি, যার দ্রষ্টা নিরীহ লালমিয়া। যুদ্ধকালের বর্ণনা টানটান; পাঠক মুহূর্তকাল অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ পায় না। যুদ্ধশেষের পর থেকে বর্তমান অবস্থায় আসতে দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠার বর্ণনা কিছুটা ক্লান্তিকর। এই বিবরণে নাজির আলির পুনর্বাসনে[৪] প্রকারান্তরে এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কিন্তু এসব কোনো বিশেষ মাত্রা অর্জন করে না। বর্তমান অবস্থায় এসে নাজির আলি

যখন প্রস্রাবের বুদবুদে বুলেট ও লালমিয়াকে মিলিয়ে যেতে দেখে, তখন গল্প আবার জমতে শুরু করে। যেন একটা জায়গা ভালো করে অবলোকন করে ট্রেনে চেপে আরেক স্টেশনে নেমে সেই জায়গায় মনোযোগ দেওয়া; দুই স্টেশনের মাঝখানে বিলীয়মান জায়গাগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া।

গল্পের দ্বিতীয় স্টেশনে অর্থাৎ বর্তমানকালের বিবরণে লেখক রূপকের আশ্রয় নেন লালমিয়া এবং তার থেকে বুলেটের মধ্যে সংক্রমিত স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে একজন মওলানাকে ঘিরে কিছু মওলানাকে দেখা যায়, যাদের পায়ের পাতা পেছনের দিকে। স্বপ্নের এই বৃত্তান্ত পড়ে সম্প্রতি ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য সম্পর্কে বহু উচ্চারিত 'জাদু বাস্তবতা'র কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু যারা '৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজাকার-মৌলবাদী-প্রতিক্রিয়াশীলদের উত্থান-বিষয়ে সচেতন, তাদের মুহূর্তে বুঝতে অসুবিধা হয় না এই পেছন-পাঅলারা কারা। বুলেটের স্বপ্নের মধ্যে, 'লোকটার গায়ের রঙ বোঝা যায় কেবল তার গালে, লালচে ফর্সা রঙ বিকালবেলার আলোতে টকটকে লাল দেখায়।'

স্মরণীয় যুদ্ধের পর অনেক দিন মক্কা শরিফে থেকে, কিছুদিন চট্টগ্রামে এক মন্ত্রীর ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা করে একদিন হঠাৎ বায়তুল মোকাররম মসজিদের দরজায় মাথা নুইয়ে প্রত্যেককে আলাদাভাবে যে লোকটা সালাম জানায় 'তার লালচে ফর্সা গালে আলোর আভা, আলখাল্লা এত বড় যে পাজামা না পরলেও তার চলে।' এই নাজির আলিই যে স্বপ্নের নায়ক, এভাবে এ তথ্য জলবৎ তরলং হয়ে পড়ে।

গল্পের উপান্তে হাউস বিল্ডিংয়ের উঁচু ছাদ থেকে জাফরি কাটা দেয়ালের পাশে দাঁড়ানো স্বপ্নের লোকটির দিকে তীব্র বেগে বুলেটের প্রস্রাবের দৃশ্যটি গল্পটিকে একটি ইচ্ছা পূরণের কাহিনির দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়। স্বাধীন দেশে, দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় নগ্নভাবে মগ্ন, লোভী, হঠকারী নাজির আলিদের উত্থান একজন সচেতন লেখককে ভাবিয়ে তোলে স্বাভাবিকভাবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন একটি দেশে বর্বর বিরুদ্ধ শক্তির কোনো উপযুক্ত বিচার তো হলোই না, উপরন্তু তারাই কালে হয়ে উঠল দেশের চালিকা শক্তি। এই পরিস্থিতিকে প্রকাশ করার জন্য লেখক শুরু করেছেন ২১ বছর আগেকার যুদ্ধের সময় থেকে, তারপর বর্তমানকালে এসে তিনি বক্তৃতা বা প্রতিবেদনের হাত থেকে বাঁচিয়ে গল্পটিকে শিল্পের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধ্য হয়েছেন রূপকের আশ্রয় নিতে।

কোনো মানুষ লেখকের টার্গেট নয়, টার্গেট পেছনে লাগানো পায়ের পাতা : প্রতিক্রিয়াশীলতা।

> কাল মসজিদের দোতলায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির পায়ে একটা গ্রেনেড মারতে পরলেও তার পায়ের ব্যারামটা সারে। পেছনে হাঁটতে বড় কষ্ট, অনেক বিপদ। (পৃ-৫৮)

এই ভাবনা বুলেটের। বুলেটের মতো অশিক্ষিত একটি ছেলের পক্ষে স্বপ্নে দেখা মওলানাদের উল্টো পায়ের পাতা সম্পর্কে এ ভাবনা কি সম্ভব—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। রূপকের এ অংশের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করার জন্য লেখক নানা দিক থেকে এগিয়েছেন সতর্কতার সঙ্গে। বুলেট একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ছেলে, তার বিবরণের ক্ষেত্রে লেখক এ কথা যেন মনেই রাখেননি। জন্মের অনতিকাল পরই মা-বাবা দুজনকে হারিয়ে সে বেড়ে উঠেছে দাদির কাছে, কিন্তু অল্পবিস্তর বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে নিরন্তর সন্তানের বীরত্বপূর্ণ বিবরণ শুনে বিরক্ত লাগত বলে দাদিকে এড়িয়ে চলেছে সে। দাদির মৃত্যুর পর টিফিন ক্যারিয়ারে ভাত বহনের চাকরি, লালমিয়ার চা-দোকানে চাকরি সব করেছে। চুরি করে জেলেও গেছে। উল্লেখ্য, *চিলেকোঠার সেপাই* উপন্যাসের পিতৃপরিচয়হীন হাড্ডিখিজিরের ছায়া আছে বুলেটের ওপর। রিকশার গ্যারেজে কাজ করা হাড্ডি খিজিরের বেশ উৎসাহ ছিল মিছিল-মিটিং-স্লোগানে। পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং গাড়ি ভাংচুরের ক্ষেত্রে সে ছিল উৎসাহী ও পারদর্শী। বর্তমান গল্পে বুলেট সম্পর্কে :

> রাস্তায় হৈ চৈ দেখলেই ব্যাটা কাজ কাম ছেড়ে বাইরে ছোটে। গোলমাল হলেই গাড়ি ভাঙে ঢিল মেরে, রাস্তার মাঝখানে বড়ো বড়ো টায়ার পোড়াবার কাজে তার উৎসাহ খুব বেশি। হরতালের দিন বারুদ-ঠাসা জরদার কৌটা ছুঁড়েছিল পুলিশের গাড়ির দিকে... (পৃ-৫৩)

টায়ার ফাটার শব্দে বুলেটের ঘুম ভেঙেছিল। সে গ্রেনেডের শব্দ ভেবেছিল প্রথমে। পেছনে পায়ের পাতাঅলা লোকদের স্বপ্নে দেখতে দেখতে তার ঘুম ভেঙেছিল, টায়ারের শব্দকে গ্রেনেড ভাবতে গিয়ে গ্রেনেড ছুড়ে মারার কথাটা তার মাথায় ঢুকেছিল, এবং ওপরে বর্ণিত ও উদ্ধৃত অংশে বুলেটের যে চরিত্র দাঁড়ায়, তাতে পায়ের অসুখ সারানোর ব্যাপারে তার আলোচ্য ভাবনাকে অসংগতিপূর্ণ, অসম্ভব ও অবাস্তব মনে হওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না।

বুলেট পেছনে পায়ের পাতাঅলা লোকদের স্বপ্নে দেখার কারণও এ গল্পে বিশ্লেষিত হয়েছে, সেটা হলো : স্বপ্নে দেখেছিল লালমিয়া, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মধ্যে নানা ধরনের 'খাব' দেখা অভ্যেসে পরিণত হয়েছিল তার। বাল্যে-যৌবনে সে সিনেমা দেখার গল্প বলে বেড়াত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা দেখা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাছে রাতে দেখা স্বপ্নের বিস্তৃত বিবরণ দিতে সে পছন্দ করত। সে-ই প্রথম পেছনে পায়ের পাতাঅলা লোককে স্বপ্নে

দেখার কথা বলেছিল বুলেটকে, বুলেটও মোটামুটি পা পর্যন্ত ঢাকা আলখাল্লা আর দাড়ির ভেতরে ফর্সামুখ নাজির আলিকে দেখে স্বপ্নে দেখা লোকটিকে সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে অবচেতনে। ('খাব' দেখার প্রসঙ্গ আমরা বিস্তারিত দেখতে পাব *খোয়াবনামার* তমিজের বাপের মধ্যে)

বাস্তবে যেমন, স্বপ্নেও তেমনি বুলেট ব্যঙ্গপ্রবণ ও সন্দেহপ্রবণ। লালমিয়ার ভাষায়, যেমন তার বাবা ইমামুদ্দিন ছিল। লালমিয়ার ধারণা, মিলিটারিকে গ্রেনেড ছুড়ে ইমামুদ্দিন তার লন্ড্রিতে ঢুকে বাঁচার চেষ্টা করেনি লন্ড্রির মালিক নাজির আলিকে মিলিটারির 'ভাউরা' জেনে পুরনো বন্ধুকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেছে বলে। বুলেটও তাকে অবিশ্বাস ও সন্দেহ করছে দেখে লালমিয়া ভাবে: 'বাপের এই খাসলৎ ব্যাটা পাইল ক্যামনে?' এই ব্যঙ্গপ্রবণ, সন্দেহপ্রবণ ছেলের পক্ষে স্বপ্নের মওলানাদের এ প্রশ্ন করা অস্বাভাবিক নয় যে, 'আচ্ছা হুজুররা, বহুত দিন তো হইয়া গেল, আপনেরা আপনেগো পাওগুলি মেরামত করেন না ক্যালায়?'

ক্ষুব্ধ হয়ে তারা বুলেটের দিকে এগিয়ে আসতে চাইলেও পায়ের পাতা তাদের নিয়ে যায় পেছনের দিকে। লেখকের উদ্দেশ্য ও তাঁর রূপকের তাৎপর্যয়ের সর্বোচ্চ ব্যঞ্জনা এখানেই দ্যোতিত। তারপর একটা পৃষ্ঠা, যেখানে বুলেট ছাদ থেকে প্রস্রাব করে, বিছানা ভেজায়, পুনরায় স্বপ্নে দেখতে বালিশ উল্টে শুয়ে পড়ে—এসব লেখকের ক্ষোভকেই শুধু মূর্ত করে, গল্পের জন্য তেমন অনিবার্য হয়ে ওঠে না।

চরিত্রকে চরিত্রের নিজস্ব অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করেন বলে লেখককে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হয়। লালমিয়াকে যুদ্ধে নিতে এসে ইমামুদ্দিন যখন বলে, মিলিটারির হাতে শহীদ কার্তিকবাবুর দোকান দখল করা বের করে দেবে নাজির আলিকে ভিক্টোরিয়া পার্কে নিয়ে গুলি করে, তখন লালমিয়া ভাবনায় পড়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদিকে মনে হয়:

> সত্যি এই মিলিটারি আর কত সহ্য করা যায়? আবার এও মনে হতো: পাকিস্তানী মিলিটারি হলো দুনিয়ার সেরা ফৌজ, তাদের সঙ্গে লড়াই করে পারবে কে? (পৃ-৪৩)

কিন্তু দিগ্বিদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যের খবর আসে, নাজির আলির দুশ্চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা বাড়ে লালমিয়ার। ইমামুদ্দিন এসে নাজির আলিকে শেষ করে দিলে লালমিয়া দোকানের মালিক হয়ে বসবে—এই ভাবনায় স্বস্তি খোঁজে সে। ইমামুদ্দিনকে লন্ড্রিতে কাজ দিয়ে সন্তুষ্ট করার কথা যখন ভাবে, তখন তার স্বার্থচিন্তা লেখকের দৃষ্টি এড়ায় না, 'ইমামুদ্দিন তখন তার গল্পে বাগড়া

দেয়ার সুযোগ পাবে কোথায়? আরে সে তো তখন লালমিয়ার কর্মচারী, নাকি?'

লালমিয়া স্বার্থচিন্তা করে, কিন্তু লেখক জানেন, তার এ চিন্তা তার প্রবণতাও স্বপ্নের অন্তর্গত, সীমিত। সে শুধু একটা লন্ড্রির মালিক হতে চায়, আর চায় বিনা বাধায় 'গল্প' বলার একটা পরিবেশ। এভাবে ইলিয়াস লালমিয়াদের স্বার্থপরতা, স্বপ্ন ও সীমাবদ্ধতাকে গল্পের ভেতর দিয়ে উপস্থিত করেন।

যুদ্ধের সময় মিলিটারিদের নির্বিচার হত্যা, শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার বিবরণ ইলিয়াস উপস্থিত করেন লালমিয়ার ভেতর দিয়ে। এই বর্ণনায় লেখক নিস্পৃহ, ব্যঙ্গপ্রবণ, ঘটনা থেকে ব্যক্তিগতভাবে দূরবর্তী—এসব বিষয় পুরো ঘটনার উপস্থাপনাকে প্রাতিস্বিক করে তুলেছে। লেখক লক্ষ রেখেছেন, এই বর্ণনায় সবদিক সুসংহত হয়ে ধরা পড়েছে কি না। অল্প কথায় এত দিক, এত কোণ উঠে আসে যে, একটি ঘটনায় যুদ্ধের সামগ্রিক ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধকে গল্পে আনতে গিয়ে এ রকম উপস্থাপনা 'খেঁয়ারি' গল্পেও লক্ষ করেছি। লেখক মিলিটারিদের বস্তি আক্রমণের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

> বস্তি ঘেরাও করে রাইফেল, এস.এম.জি এবং কয়েকটা গ্রেনেড পাওয়া গেল। ঐ ঘরের লোকজন সব আগেই হাওয়া, তাদের ধরতে না পেরে বস্তির যাবতীয় মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি ও শিশুদের একচোট বানানো হলো। ইমামুদ্দিনের ১২/১৩ বছরের ভাই ও ইমামুদ্দিনের বাপকে আচ্ছাসে জখম করা হয়েছিল, তাদের তোলা হলো মিলিটারির লরিতে। মারধোর ও ধরাধরির কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে মিলিটারি এবার বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার শুরু করলো। তাদের যাবতীয় তৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহ এই আগুন-লাগা ঘরের দিকে টার্গেট করে ব্রাশ ফায়ারের কাজে। হাজার হলেও দুনিয়ার সেরা ফৌজ, হাতিয়ারের ট্রিগার টেপার চেয়ে তাদের বড়ো সুখ আর কীসে থাকবে? (পৃ-৪৭)

যুদ্ধ শেষে পাড়ার ছেলেরা পাড়ায় ফিরে আসে বিজয়ীর বেশে—এ দৃশ্যের বর্ণনায় একটু প্রগলভ হওয়ার সুযোগটুকু লেখক নেন না। একটু অন্য রকম একটা বাক্যেই ইলিয়াস বিজয়ী ছেলেদের ফেরার যে ব্যঞ্জনা, তাকে দ্যোতিত করেন, 'ঐ বছরের শেষে শীতের ভেতর কুয়াশার রোদ জ্বালিয়ে পাড়ার ছেলেরা পাড়ায় ফেরে।' একটু অন্য রকম বলেছি 'শীতের ভেতর কুয়াশার রোদ জ্বালিয়ে' অংশটার জন্য, কারণ এই বাক্যাংশের দ্যোতনা অনেক রকম। আবার এই বহুমাত্রিকতার সম্ভাবনা লেখকের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে না।

ইলিয়াস যাদের গল্প নিয়ে আসেন, তাদের মন ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি থাকেন সজাগ-সচেতন, ফলে এদের সামাজিক অবস্থান ও সেখান থেকে উদ্ভূত

মানসিক ক্রিয়া পাঠকের সামনে একটা পূর্ণতা নিয়ে উপস্থিত হয়। 'কান্না' গল্পে মৌলবি আফাজ আলি গোরস্তানে মৃতের জন্য মোনাজাত করে নিজে কাঁদে, সবাইকে কাঁদায়, কিন্তু ওই অবস্থাতেও তার ছেলের চাকরির ব্যাপারে আসা মনু মিঞা যেমন তার দৃষ্টি এড়ায় না, তেমনি মোনাজাতে শামিল ক্রন্দনরত অভিজাত মানুষগুলো মাঝেমধ্যে নিজেদের পকেট ছুঁয়ে দেখতে ভোলে না; ভোলে না 'দিনকাল খারাপ, যেখানে সেখানে পকেটমার, প্রাণ ভরে কাঁদার পথও ভদ্রলোকের বন্ধ হয়ে আসছে।' এ কথা ভাবতে।

আফাজ আলি নামাজে দাঁড়িয়ে ইমামের 'আল্লাহ আকবর'-এর চেয়ে গোরস্তানের গেটে গাড়ির শব্দ শুনতেই উৎকর্ণ থাকে বেশি। তাকে নামাজে দাঁড়িয়েই ভাবতে হয় :

> লাশের দাফন, জিয়ারত, মোনাজাত ধরতে পারলে কিছু কামাই হয়, তাহলে মনু মিঞাকে দিয়ে বাড়িতে কয়েকটা টাকা পাঠানো যায়। (পৃ-৬৫)

এভাবে লেখক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে চলমান মানুষের বহিরিস্থিত ও অন্তরিস্থিত প্রবণতা ও ভাবনাগুলো পাঠকের উপলব্ধিতে নিয়ে আসেন।

সমাগত শবে বরাতের রাতের পুরো চিত্র আফাজ আলির চিন্তায় চলে আসে, বলা যায় লেখক নিয়ে আসেন; এতে শুধু জীবিতদের প্রতি নয়, মৃত স্বজনদের প্রতিও জীবিত অভিজাত মানুষদের হঠকারিতা স্পষ্ট হয়। 'মুর্দার সাথে জিন্দার সেদিন মিলনের রাত। মুর্দা প্রিয়জনদের জন্য জিন্দা মানুষের মোহাব্বত ছোটে সেদিন নহরের মতো।' আফাজ আলির চেতনায় উপস্থিত মৃতের প্রতি জীবিতের এই লোক-দেখানো ভালোবাসার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গ চাপা থাকে না। কিন্তু বছরের এই দিনটি আফাজ আলির জন্যও 'একদিন'; এই রাতের উপার্জনের জন্য সন্তানের অসুস্থতার খবর শুনেও (সন্তান ইতোমধ্যে মৃত, সে জানে না) সে বরিশাল যেতে দ্বিধা করে। বুঝতে পারি, মৃত্যুর পর মৃতদের কবর দিতে এবং তারপর বছরে একদিন শবে বরাতের রাতে যারা গোরস্তানে আসে, তাদের আন্তরিকতা যেখানে ঠুনকো, সেখানে অর্থকষ্টে জর্জরিত আফাজ আলির মোনাজাতও টাকার মূল্যে বিবেচিত হতে বাধ্য। গোরস্তানে দোয়া-দরুদ পাঠ ও জেয়ারতে অভ্যস্ত আফাজ আলি সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে 'ইন্নালিল্লাহ' বলার কথাও ভুলে যায়। গোরস্তানে মৌলবি আফাজ আলির কর্মকাণ্ডের বর্ণনা নিরুত্তাপ, কিন্তু পিতা আফাজ আলির মানসিক অবস্থার বিবরণে লেখকের কলমে তাপ সঞ্চারিত হয়, মানবিক তাপ :

> আফাজ আলি শুধু পায়রার (পায়রা নদী) ঢেউ দেখে। ফাল্গুনের রোদে ঢেউগুলো রোদ পোহায়, এইসব ঢেউয়ের নিচে জলস্রোত ওঠানামা করে জলে-ডোবা মানুষের লাশের ওপর। নিচে কী হলো যে কবরগুলো এভাবে কাঁপে। ওখানে কি গোর আজাব হচ্ছে? (পৃ-৬৯)

পিতা আফাজ আলির মর্মন্তুদ বেদনা ও যন্ত্রণা অল্প কথায় নদীর জলস্রোত ও ঢেউয়ের প্রতীকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পুত্রের জন্য পিতার বেদনা নিয়ে দীর্ঘ সময় নষ্ট করবেন তেমন লেখক ইলিয়াস নন—এসব অল্প কথায় ছড়িয়ে দিয়ে তিনি চলে যান বস্তুজগতে, যেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সতত ব্যস্ত বেঁচে থাকার সংগ্রামে আর নিদারুণ হঠকারিতায়।

যে গোরস্তানে মৃতের পরকালীন শান্তি-কল্যাণ কামনার নামে মৃতের স্বজন এবং মওলানা ও গোরস্তানের গোরকোন-কাম-মালির ব্যবসা চলে, টাকার বিনিময়ে কবরের পরিচর্যা এবং মোনাজাতে দাঁড়িয়ে মৃত স্বজনের জন্য কান্নার অভিনয় চলে, সে গোরস্তানে মরে লাশ হয়ে আসতে বা লাশের স্বজন হয়ে আসতে যে কেউ পারে না। এমন এক গোরস্তানের মুখোমুখি ইলিয়াস আমাদের দাঁড় করান যেখানে মৃত লাশও তার জীবনকালের আভিজাত্য বজায় রাখে। এক কলেজ মাস্টারের ওপর আফাজ আলির ক্ষোভের ভেতর দিয়ে লেখক জানাচ্ছেন :

> কোন এক কলেজের মাস্টার, এই গোরস্তানে ঐ সব মানুষকে পোছে কে? মুর্দা হোক আর জিন্দা হোক, এখানে আসে সব বড় বড় মার্চেন্ট, ফরেনারদের অফিসে কাজ-করা সায়েবরা এখানে আসে, এই কাঁচাপাকা চুলকে এখানে গুণতির মধ্যে ধরা যায়? মরহুম শ্বশুরের জন্য তবু এখন আসতে পারো, মরলে তোমার লাশ ঢুকতে পারবে এখানে? (পৃ-৬৪)

কিন্তু এই আফাজ আলির জায়গাও কি মৃত্যুর পর এই গোরস্তানে হবে? এর উত্তর এ গল্পের অন্যত্র রয়েছে। আফাজ আলির ছেলেকে যে গোরস্তানে দাফন করা হয়েছে তার অবস্থা ভয়াবহ, সেখানে পায়খানার গন্ধ, রাতে 'শেয়ালের খোঁড়া কবরগুলো থেকে উঁকি দেয়া' 'মুর্দাদের খুচরা-খাচরা ঠ্যাং, রান বা হাঁটুর' গন্ধে আফাজ আলির পক্ষে মোনাজাত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বুঝতে পারি, যে গোরস্তানে আফাজ আলি জীবন কাটায়, মৃত্যুর পর কলেজ মাস্টার কেন আফাজ আলির জায়গাও হবে না সেখানে।

এ গল্পের অন্তত দুটি জায়গা বাস্তবতা ও সংহতির ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় :

১. সন্তানের কবর জেয়ারত করতে এসেই আফাজ আলি টাকার চিন্তায় যেভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, হাবিবুল্লা বেঁচে থাকলে চাকরি করে কিস্তিতে এ টাকা শোধ করতো, 'নিজের আওলাদ তাকে এতটুকু সাহায্য করলো না'—এসব ভাবনা সদ্য সন্তানহারা একজন পিতার পক্ষে খুব

বাস্তবসম্মত মনে হয় না। আমরা ভুলে যাচ্ছি না যে, চিন্তাগুলো আফাজ আলিকেই করতে হবে, পুত্রের মৃত্যুতে সে প্রকৃতপক্ষে অথই জলেই পড়েছে, তা সত্ত্বেও যে সময় তাকে এসব বিষয়ে ভাবনাকাতর দেখছি, সে সময় একজন পিতার পক্ষে তা কিছুটা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

২. গোরস্তানে আফাজ আলিদের জেয়ারত-মোনাজাত, কবরের পরিচর্যা—সবই যে একধরনের ব্যবসা, তা গল্পের ছত্রে ছত্রে বোঝা যাবে। এরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় মোনাজাত ধরার ব্যাপারে; কবর পরিচর্যার ব্যাপারে মৃতদের অভিজাত স্বজনের সঙ্গে তাদের থাকে একধরনের অলিখিত চুক্তি। আফাজ আলিকে দেখা যায় শবেবরাতের আগে মৃতদের আত্মীয়দের টেলিফোনে স্মরণ করিয়ে দিতে। সবই টাকার জন্য। ফলে, এক মৃতের মেয়েজামাইয়ের কণ্ঠে, যে কিনা কোনো কলেজের শিক্ষক, 'আপনারা গোরস্তানে ব্যবসা ফেঁদেছেন ভালই'—এসব কথা অতিকথনে পর্যবসিত হয়, গল্পের সংহতিকে যা কিছুটা হলেও বিপন্ন করে।

'কান্না' গল্পের শেষ অংশ পাঠ করে মহাশ্বেতা দেবীর দীর্ঘ গল্প 'রুদালি'র কথা মনে পড়ে। ভারতের যে এলাকাকে পটভূমি করে 'রুদালি' রচিত, সেখানে অভিজাতদের মৃত্যুর পর রুদালি তথা কান্নাওয়ালিদের ভাড়া করা হয় কান্নার জন্য। 'রুদালি' গল্পে যে মা নিজের সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদতে পারেনি, সে অপরের জন্য টাকার বিনিময় কাঁদতে গিয়ে মূলত নিজের মৃত সন্তানের জন্যই তার বেদনাকে উগড়ে দেয়। 'কান্না'য় আফাজ আলিকে সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদতে দেখা যায় না, সে তাৎক্ষণিকভাবে দোয়া-দরুদ পাঠ করতে পর্যন্ত ভুলে যায়। পরে সে যে গোরস্তানে কবর জেয়ারত করায়, লাশ দাফনের পর মোনাজাত ধরে টাকার বিনিময়ে, সেখানে এসে, 'শাহতাব কবির' নামে এক মৃত যুবকের জন্য মোনাজাতে কাঁদতে গিয়ে মূলত নিজের সদ্য মৃত সন্তান হাবিবুল্লার জন্যই নিজের অসহায়ত্ব ও বেদনাকে ছড়িয়ে দেয়। এ দৃশ্যকে বাস্তবসম্মত ও বর্ণনাকে প্রাঞ্জল করার জন্য ইলিয়াস অবশ্য ব্যবহার করেন গোরকোন শরিফ মৃধাকে। 'আল্লা, তার নাদার বাপটার কথা একবার তুমি ভাবিয়া দেখলা না?' আফাজ আলি মোনাজাতে এ কথা বলার পর আমরা দেখি তার 'গেরাইম্যা লবজের' প্রয়োগে শরিফ মৃধা উদ্বিগ্ন, তার ভাবনা, মোনাজাতে হুজুরের জবান সব সময় খুব চোস্ত। কিন্তু এখানে ওই 'গেরাইম্যা লবজে'ই আল্লাকে ডাকতে ডাকতে আফাজ আলি যখন প্রশ্ন তোলে, 'আল্লা, তার নাদান বাপটা কি খালি গোর জিয়ারত করার জন্যই দুনিয়ায় বাঁচিয়ে থাকবো?' তখন, এই এক বাক্যেই অন্যের জন্য মোনাজাতকারী আফাজ আলি মৃত হাবিবুল্লার

পিতায় রূপান্তরিত হয়। তার সন্তান হারানোর কষ্ট, স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঢাকার গোরস্তানে পড়ে থাকার দুঃখ আর বিরতিহীন নিঃসঙ্গতা ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরের ভয়াবহতার চেয়েও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

সত্য সর্বগ্রাসী, সে আসতে পারে সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, প্রেমের জোয়ারের মধ্যে, জীবনের দুর্বিষহ দৈন্যের ভেতরে। ইলিয়াস দেখাতে চান, চাইলেই আমরা কিছু এড়িয়ে যেতে পারি না। 'প্রেমের গপ্পো' গল্পে জাহাঙ্গীরের সমস্ত মিথ্যে প্রকাশিত হয়ে যায়, জাহাঙ্গীর বুলাকে যেসব গল্প বলেছে, সেসব তার স্বপ্ন, গল্পের উপান্তে তার স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ছড়িয়ে পড়ে। 'ফোঁড়া' গল্পে মামুন এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল রিকশাঅলার পুঁজসমেত দগদগে ফোঁড়াটাকে, কিন্তু নাছোড়বান্দা রিকশাঅলা পুঁজ-ফোঁড়া তো দেখিয়েছেই, সঙ্গে দেখিয়েছে সংলগ্ন নুনুটাও। 'জ্বাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল' গল্পে লালমিয়ার স্বপ্নবয়ান শেষ পর্যন্ত অকথিতই থেকে যায়। সন্তান চাকরি করে চাকরির জন্য দেওয়া ঘুষের টাকা উসুল করে বাপকে গোরস্তান থেকে নিয়ে যাবে—পিতা আফাজ আলির এই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায় ওই সন্তানের মৃত্যুতে। গল্পগুলোর মূল ঘটনাবলির কোনটিকে অস্বীকার করব? আমাদের সামনে ঝুলছে এক স্বপ্নের জাল, নাকি ঝুলানো হয়েছে এটি? এই স্বপ্নের জালের ভেতর দিয়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে, জাল স্বপ্ন, নকল স্বপ্ন—একদিন স্বপ্ন ভেঙে যায়, তারপর কেউ নূরুল হুদার (রেইনকোট*) মতো ঘুরে দাঁড়ায়, কেউ বুলেটের মতো পশ্চাৎগামী প্রতিক্রিয়াশীলদের দিকে প্রস্রাব ছুড়ে দেয় আর কেউ সন্তান হারিয়ে আফাজ আলির মতো আর্তনাদ করে :

> পাক পরওয়ারদিগার, তার বাপটাকে কি তোমার নজরে পড়লো না?
> বাপটা কি তামাম জীবন খালি গোরস্তানেই থাকবো?

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল-এ অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলো তো বটেই, এমনি তার অন্যান্য গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ পাঠের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে একজন স্বপ্নভঙ্গের কথাকার বলা যায়। স্বপ্নের ঘোর সহজে কাটে না। গল্পগুলো স্বপ্নভঙ্গের।

---

*[*জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল* গ্রন্থের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প 'রেইনকোট'-এর আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে, 'অপঘাত' গল্পের সঙ্গে]

> তিনি নিজের কৃতিত্বের কথা এমনভাবে বলতেন যে, মনে হতো হি ওয়াজ স্পিকিং এবাউট সামবডি এলস।...হিউমার খুব একটা করতেন না, তবে হিউমার এ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারতেন চমৎকার। এরকম তরল-আবেগ-বর্জিত ঋজু স্বভাবের মানুষ আমি আর দেখিনি বললে চলে।২

এ কথাগুলো ইলিয়াস সম্পর্কেও সত্য, তিনি তাঁর দাদার স্বভাব পেয়েছেন কিছুটা, তাঁর লেখায় এর ছাপ পড়েছে। ইলিয়াসের রচনা পাঠ করে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তিনি নিজেও একজন 'তরল-আবেগ-বর্জিত ঋজু স্বভাবের মানুষ।'

তাঁর বাবা তাঁদের সময় দিতে পারতেন না, কিন্তু অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ৭ম জন্মদিনে বাবা তাঁকে সুকুমার রায়ের *আবোল-তাবোল* উপহার দিয়েছিলেন, এই বই ৫৩ বছর বয়সেও তার কাছে ছিল সমান প্রিয়।৩ তাঁর বাবা কোনো সিদ্ধান্ত বা ধারণা সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। ইলিয়াস নিজের ইচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়েছেন। সরাসরি না হলেও প্রচুর বই পড়ার সুযোগ দিয়ে, মতামত গড়ে ওঠায় বাধা না দিয়ে, ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে না দিয়ে এবং ধর্মের আচরণগুলো মেনে চলতে কোনো দিন কিছুমাত্র চাপ না দিয়ে স্বাধীন হওয়ার সুযোগ দিয়ে সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর বাবা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।৪

ছোটবেলায় মা তাকে রবীন্দ্রনাথের *চয়নিকা* থেকে দুঃখের এবং কাহিনিনির্ভর কবিতাগুলো পাঠ করে শোনাতেন। ১২/১৩ বছর বয়সে মা তাঁকে রবীন্দ্রনাথের *গোরা* এবং পার্ল বাকের *গুড আর্থ* ও মাক্সিম গোর্কির *মা*-র বাংলা অনুবাদ পড়ে শোনাতেন।৫ পড়া শুনেই নিজে নিজে এসব পড়তে শুরু করেছিলেন ইলিয়াস। সন্দেহ নেই, সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি এবং মানস-গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর মা বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঢাকা কলেজের আড্ডায় ইলিয়াসের কয়েকজন লেখক-বন্ধু ছিলেন। এ সময় গল্প নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে আবদুল মান্নান সৈয়দের সঙ্গে। কয়েকজন বন্ধু মিলে *ময়ূখ* নামে একটি পত্রিকা বের করার কাজ চূড়ান্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত *ময়ূখ* প্রকাশিত হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর গড়ে ওঠে নতুন আড্ডা। এ সময় তিনি সার্ত্রে এবং অমিয়ভূষণ মজুমদারের রচনার সঙ্গে পরিচিত হন। সাম্প্রতিকতম ইংরেজি বই ও পত্রিকা তিনি পড়তেন ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়ে। ইলিয়াস বলেছেন :

> কলকাতার 'নতুন সাহিত্য' আর 'চতুরঙ্গ' তখন সবচেয়ে ভালো সাহিত্য পত্রিকা। এই সব পত্রিকা এবং বাংলা ইংরেজি উপন্যাস, গল্প, কবিতা আমার সমকালীন আর সবার মতো আমাকে একটু একটু তৈরি করেছে।৬

পরিশিষ্ট

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : জীবন ও কৃতি

১. জন্ম-শৈশব-শিক্ষা-অনুপ্রেরণা

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে তাঁর মাতুলায়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম বদিউজ্জামান মোহাম্মদ ইলিয়াস (বি এম ইলিয়াস, মৃত্যু : ২৪ অক্টোবর ১৯৮৭) এবং মায়ের নাম বেগম মরিয়ম ইলিয়াস (মৃত্যু : ৩ অক্টোবর ১৯৯৫)। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বগুড়া শহরের প্রান্তে নারুলি গ্রামে। করতোয়া নদীর এক পাশে নারুলি গ্রাম, অন্য পাশে বগুড়া শহর। চার বছর বয়স পর্যন্ত ইলিয়াসের এখানেই কাটে। একটি রাজনৈতিক পরিবারে ইলিয়াসের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি শিক্ষকতা, ব্যবসায়ে ও বগুড়া শহরে রেডক্রসের সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি করেছেন। ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে ইলিয়াসের বাবা সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন।১

ঢাকা সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলে ইলিয়াসের শিক্ষাজীবনের শুরু। দেড় বছর পর তাঁকে ভর্তি করানো হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯৫৩ সালে ইলিয়াসের বাবা বগুড়ার জলেশ্বরীতলায় বাড়ি কেনেন। ইলিয়াসও বদলি হয়ে যান বগুড়া জিলা স্কুলে—এই স্কুল থেকেই তিনি মেট্রিক পাস করেন ১৯৫৮ সালে, দ্বিতীয় বিভাগে। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। ১৯৬০ সনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালে তিনি বিএ অনার্স এবং ১৯৬৪ সালে এমএ পাস করেন।

ইলিয়াসের জীবনের প্রথম যে চার বছর নারুলি গ্রামে কেটেছে, সে সময়ের স্মৃতি তাঁর কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু ওই একান্নবর্তী পরিবারে অবসরপ্রাপ্ত অফিসার দাদার সঙ্গ তাঁর কাম্য ছিল। পরে তিনি যখনই বগুড়া গেছেন, দাদার আকর্ষণে ছুটে গেছেন নারুলি গ্রামে। তাঁর দাদা খুব অহংকারী এবং আত্মসচেতন মানুষ ছিলেন। ইলিয়াসের ভাষ্য :

রফিক আজাদ সম্পাদিত *স্বাক্ষর*-এর সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন তিনি। আবদুল মান্নান সৈয়দ, মুস্তাফা আনোয়ার, আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক—তাঁরাও ছিলেন; আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁদের একত্র করেন *কণ্ঠস্বর*-এ।৭ ১৯৬৫ সালে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় প্রকাশিত *সাম্প্রতিক ধারার গল্প*-এ ইলিয়াসের 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

কবিতা দিয়ে ইলিয়াসের সাহিত্যচর্চার সূচনা। তিনি বলেন, 'যখন শব্দ লিখতে শিখি বলতে গেলে তখন থেকেই কবিতা লিখছি।' পরেও তিনি কবিতা লিখেছেন। *স্বাক্ষর*-এর একাধিক সংখ্যায় তাঁর কবিতা মুদ্রিত হয়েছে।৮ ইলিয়াস প্রথম গল্প লেখেন ৮ বছর বয়সে 'খালেক ও তাহার মাতা' শিরোনামে। কলকাতার *সত্যযুগ* পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। *আজাদ*-এর ছোটদের পাতা 'মুকুলের মহফিল'-এ তাঁর কয়েকটি শিশুতোষ গল্প ছাপা হয়। 'বংশধর' নামে তাঁর একটি গল্প মুদ্রিত হয় *সওগাত*-এ। তখন তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯৬১ সালে বসন্ত রোগ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা কালে এক পুরুষ নার্সকে বিষয় করে 'অতন্দ্র' নামে একটি গল্প লেখেন ইলিয়াস। তিনি বলেন :

> একজন সুস্থ স্মৃতিকাতর ও বিষণ্ন একজন তরুণকে তার চেতনাপ্রবাহের মধ্যে দ্যাখার ইচ্ছে ছিল, বলা যায় তার টুকরো একটি অংশ খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম।৯

'অতন্দ্র' ছাপা হয়েছিল সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল*-এ ১৯৬১ বা ১৯৬২ সালে।১০ এ সময় জেমস জয়েসের *আ পোর্ট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ অ্যা ইয়ং ম্যান* পড়ে ইলিয়াস খুব প্রভাবিত হন। এ জন্য 'অতন্দ্র' গল্পটি ইলিয়াস তাঁর কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে—*অন্য ঘরে অন্য স্বর*। বইটি খুব বিক্রি না হলেও এটি পড়ে সমকালীন লেখকেরা খুব সাড়া দিয়েছিলেন। সৈয়দ শামসুল হক টেলিভিশনে এর প্রশংসা করেন, হাসান আজিজুল হক 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বিষবৃক্ষ' নামে সমালোচনা লেখেন রাজশাহীর *বৃত্তায়ন*-এ। পরে লেখাটি হাসান আজিজুল হকের *কথাসাহিত্যের কথকতা* গ্রন্থে সংকলিত হয়। আবুল হাসনাত *সমকাল*-এ, সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় *দৈনিক সংবাদ*-এ, মাজহারুল ইসলাম *দৈনিক বাংলায়* এবং মাহবুবুল আলম *গণসাহিত্য* পত্রিকায় বইটির সমালোচনা লেখেন। এই বইয়ের জন্য ইলিয়াস ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবির প্রদত্ত হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।১১

পাঠক হিসেবে ইলিয়াসের কোনো বাছবিচার ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর ভাষ্য :

> যে কোনো বিষয়ের বই, যদি তা আমার বিদ্যাবুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে পড়ে তো আমি একটানা পড়ে ফেলি। সাইনবোর্ড বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে অতি ফালতু উপন্যাস, সিরিয়াস উপন্যাস, ছড়ার বই, শ্রেষ্ঠ কবিতার বই, খোয়াবনামা, পর্নোগ্রাফি, সমাজবিজ্ঞানের বই, রাজনৈতিক দলের লিফলেট, কমনসেন্স অফ সায়েন্স-জাতীয় বই, বাচ্চাদের জন্য লেখা বই এবং বাচ্চাদের লেখা এটা-ওটা, ওষুধের লিটারেচার, সিনেমার গান—কী নয়?১২

২. কর্মজীবন

এমএ পাস করার অব্যবহিত পরই ১৯৬৫ সালের শুরুতে ইলিয়াস করোটিয়া সাদত কলেজে যোগ দেন বাংলার প্রভাষক হিসেবে। এ কলেজে তিনি পড়িয়েছেন মাত্র কয়েক মাস। এ বছরই তিনি যোগ দেন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বাংলা বিভাগে। এখানে দীর্ঘ ২০ বছর (১৯৬৫-৮৫) শিক্ষকতার পর ১৯৮৫ সালে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপপরিচালক পদে যোগ দেন। এ সময় সরকারি কাজে তাঁকে পঞ্চগড়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নোয়াখালী, হাতিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে যেতে হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : কলকাতা ছাড়া দেশের বাইরে কোথাও আমি যাইনি, কিন্তু দেশের ভেতরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি ঘুরেছি।১৩ ১৯৮৭ সালের শেষ দিকে তিনি ঢাকা মিউজিক কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এ বছরই তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ে। ১৯৯৫ সালে অধ্যাপক এবং পরে বিভাগীয় প্রধান হন।

৩. কথাসাহিত্যের অন্য শাখা : উপন্যাস

ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রথম খ্যাতি অর্জন করলেও পরে তিনি উপন্যাসেই নিমগ্ন হন। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা দুই : ১. *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬, ঢাকা; ১৯৯৩, কলকাতা) ২. *খোয়াবনামা* (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, ঢাকা; এপ্রিল ১৯৯৬, কলকাতা) ইলিয়াসের দুটি উপন্যাসই বৃহদাকারের। *চিলেকোঠার সেপাই*-এ পরিচ্ছেদ রয়েছে ৫৩টি, খোয়াবনামায় ৫৯টি। *চিলেকোঠার সেপাই* লিখতে শুরু করেন ১৯৬৫ সালে; এক পৃষ্ঠা লিখেই তিনি থেমে যান।১৪ পুনরায় লিখতে শুরু করেন ১৯৭৮ সালে, শেষ করেন ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৬ সালে *দৈনিক সংবাদ*-এ এটি

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ৪ সংখ্যা প্রকাশের পর *সংবাদ* এটির প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। সেই বছরেই সাপ্তাহিক *রোববার*-এ সম্পূর্ণ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, একই বছর অক্টোবরে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানকে পটভূমিতে রেখে *চিলেকোঠার সেপাই* রচিত। একদিকে '৪৭ সালের ভারত বিভাগ থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও '৬৯-এর আন্দোলন, অন্যদিকে মহানগর ঢাকা থেকে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও চর এলাকা পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডজুড়ে এ উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ। চিলেকোঠায় বসবাসকারী আত্মপ্রেমে পরাজিত, আত্মদ্বন্দ্বে বিক্ষত ওসমান ও রাজপথে আন্দোলনকারী পিতৃপরিচয়হীন বঞ্চিত হাড্ডিখিজিরের জীবনযাপন, সমকালের বুর্জোয়া ও বাম রাজনীতির বিরোধ ও ব্যর্থতা, গ্রামে জোতদার শ্রেণীর শোষণ এবং ভূমিহীনদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ—বিচিত্র মানুষ ও বিচিত্র ঘটনাবলি এ উপন্যাসে সংহতি লাভ করেছে। শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন :

> ইলিয়াসের এই মহাকাহিনী শহর থেকে গ্রামে আবার গ্রাম থেকে শহরে যে বুনট বয়ন করেছে তাতে অধিবাস্তব এসে মিশেছে বাস্তবে, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বিচিত্র বহুচরিত্র, তাকে মজবুত এবং ঢেউ খেলানো করেছে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার পারদর্শী প্রয়োগ।...এতে না আছে রোমান্স, না আছে নায়ক-নায়িকা, কিন্তু যে রুচিমান পাঠক-পাঠিকা কথাসাহিত্যে উৎকর্ষের সন্ধান করেন, এ বই তাঁর অবশ্য পঠনীয়।১৫

কথাশিল্পী আবুল বাশার এ উপন্যাসে লক্ষ করেছেন 'মহাকাব্যিক বিস্তার', তাঁর মতে :

> চিলেকোঠার সেপাই ভাষাগত কারণেই শুধু নয়, আন্দোলন-মানসিকতা, সমাজ-চলিষ্ণুতা এবং সাংস্কৃতিক-অভিজ্ঞান-সাম্যেও বাংলা সাহিত্যের বিভক্ত বাংলার অবিভাজ্য সম্পদ এবং সারস্বত-সুকৃতি।১৬

খোয়াবনামার প্রথম ৩ পরিচ্ছেদ *লিরিক* 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা'য় প্রকাশিত হয়। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত *দৈনিক জনকণ্ঠ*-এ ধারাবাহিকভাবে *খোয়াবনামার* ৩৪টি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। এরপর *জনকণ্ঠ* লেখকের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে আকস্মিকভাবে 'সমাপ্ত' লিখে দেয়।১৭

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইলিয়াস কলকাতায় চিকিৎসাধীন থাকা কালে ঢাকা থেকে *খোয়াবনামা* প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসের জন্য এ বছর তিনি কলকাতার প্রফুল্ল কুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। *খোয়াবনামা* উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরের বাংলাদেশের কাৎলাহার নামক

এক প্রত্যন্ত স্থানের ভূমিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীর স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন ইলিয়াস। ভারত বিভাগ, তেভাগা আন্দোলন এ উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কাৎলাহার বিলের ধারে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে সোভানধুমা নামে এক তেজস্বী পুরুষ। সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাৎলাহারের মালিকানা চলে যায় জমিদারের হাতে। এ পরিবেশে ভূমিহীন মানুষ হতে থাকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর। চেরাগ আলি মানুষের স্বপ্নের অর্থ বলে দেয়, কিন্তু পুরনো ছেঁড়া এক খাবনামা আর নাতনি কুলসুম ছাড়া তার নিজের কোনো সম্বল নেই, স্বপ্নও নেই। এ উপন্যাসে চেরাগ আলি আবহমান বাংলার কুসংস্কার ও প্রগতিশীলতা, গৃহপ্রেম ও গৃহবিমুখতা—পরস্পরবিরোধী এই সব দ্বৈতসত্তার উপস্থাপক। কাৎলাহার বিলের মানুষের স্বপ্ন, নিষ্ঠুরতা, যৌনতা, দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট, আশা-নিরাশা-সংগ্রাম বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য-হাতাশা-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে কলকাতা সংস্করণের প্রকাশক যে কথা বলেছেন, তাঁর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> হাতে গোনা যে-কটি চিরায়ত সাহিত্যকৃতি আমাদের রচিত হয়েছে 'খোয়াবনামা' তাদেরই সগোত্র। দেশভাগ-তেভাগা-আধিয়ার-নিম্নবর্গীয় জীবনযাপন ও বিশ্বাসের আখ্যান যেমন সেরকমই বাংলার সাধারণ মানুষ-সৃষ্ট সমাজেতিহাসের এক বিস্তৃত দলিল এই মহাকাব্যোপম রচনা।১৮

৪. অসুস্থতা

১৯৯৫ সালে, নভেম্বরে ইলিয়াস তাঁর ডান পায়ের উরুতে প্রবল ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে চিকিৎসকেরা তাঁর ডান পায়ের উরুর হাড়ের মধ্যে ক্যানসার শনাক্ত করেন। চিকিৎসার জন্য ২৬ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় যান, ২০ মার্চ সেখানে তাঁর অপারেশন হয়, তাঁর ডান পা গোড়া থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ২৭ এপ্রিল তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। তারপর তিনি ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করতেন। কলকাতায় অবস্থানকালে সেখানকার ৫টি সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁকে সংবর্ধনা দেয় ১ বৈশাখ ১৪০৩। সংগঠনগুলো হলো: আবর্ত, বঙ্গবসুন্ধরা, একুশে উদ্‌যাপন মঞ্চ, সুরাহা সম্প্রীতি ও যুক্তাক্ষর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কথাশিল্পী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। কলকাতায় থাকা কালে পশ্চিমবঙ্গের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁকে দেখতে যান। বাবরি মসজিদ ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে নির্ভীক বক্তব্য রাখার কারণে সাম্প্রদায়িক শক্তি কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত ছিলেন বর্ষীয়ান সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। তখন তাঁর বয়স ৯৩ বছর। প্রকাশ্যে রাস্তায়

বেরোনো নিরাপদ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি এসেছিলেন ইলিয়াসকে দেখতে।১৯ বাংলাদেশ থেকে তাঁকে যাঁরা দেখতে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি শামসুর রাহমান। ইলিয়াসের অস্ত্রোপচারের সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী, বিশেষ করে সাহিত্যের ছাত্রছাত্রী লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিলেন রক্ত দেওয়ার জন্য। অনেক লেখকও রক্ত দিতে গিয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের সময় যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, তাঁদের একজনকেও শেষ পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি। ইলিয়াস বলেন, 'অথচ তাঁদের রক্ত বইছে আমার ধমনীতে, আমার শিরা উপশিরায়।'২০

কলকাতায় চিকিৎসা শেষে ঢাকায় আসার পরও ইলিয়াসকে কয়েকবার কেমোথেরাপি দেওয়া হয়। এ জন্য তাঁর চমৎকার চুলগুলো চলে যায়। পা কেটে ফেলার আগে ডাক্তারকে তিনি বলেছেন, পা কেটে ফেলবেন দুঃখ নেই, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করে দেবেন, যাতে আমি চেয়ারে বসতে পারি।২১ ডাক্তার সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যত দিন পেরেছেন, ক্রাচে ভর দিয়ে এসে নিয়মিত লেখার টেবিলের সামনে বসেছেন। লিখেছেন আর টাইপ রাইটারে শব্দ তুলে কপি করেছেন। ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ভোরে ঢাকার একটি ক্লিনিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫. স্বীকৃতি

১. গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর*-এর জন্য বাংলাদেশ লেখক শিবির প্রদত্ত হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার : ১৯৭৭।

২. ছোটগল্পে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার : ১৯৮৩।

৩. উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই*য়ের জন্য আলাওল স্মৃতি পুরস্কার : ১৯৮৭।

৪. সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বিকাশ সাহিত্য পুরস্কার : ১৯৮৯-৯০।

৫. কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বগুড়া লেখকচক্র পুরস্কার : ১৯৯১।

৬. উপন্যাস *খোয়াবনামার* জন্য প্রফুল্ল কুমার সরকার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার : ১৪০২ (১৯৯৬)। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা তাঁকে এ পুরস্কার দেয়।

৭. কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী প্রদত্ত সাদত আলী আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার : ১৯৯৬।

৮. কথাসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য জেবুন্নেসা-মাহবুব উল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার : ১৯৯৬।

৬. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে উৎসর্গীকৃত বই (১৯৯৫ পর্যন্ত)

১. সাধন চট্টোপাধ্যায় : *বেলা অবেলার কুশীলব*, কলকাতা। ছোটগল্প-লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ইলিয়াসকে 'ওপার বাংলার ধ্রুপদী কথাসাহিত্যিক' বলে উল্লেখ করেন।
২. স্বপ্নময় চক্রবর্তী : *নির্বাচিত গল্প* (হাসান আজিজুল হকসহ)
৩. হাসান আজিজুল হক : *রাঢ়বঙ্গের গল্প*
৪. আল মাহমুদ : *পানকৌড়ির রক্ত* (মাহমুদুল হকসহ)
৫. বদরুদ্দীন উমর : *নির্বাচিত বক্তৃতা*
৬. নাসরীন জাহান : *সারারাত বিড়ালের শব্দ* (হাসান আজিজুল হকসহ)
৭. শওকত আলী : *দক্ষিণায়নের দিন, কুলায় কালস্রোত, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন*—তিনখণ্ডে প্রকাশিত এ উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড ইলিয়াসকে উৎসর্গ করা হয়। প্রথম দুই খণ্ড উৎসর্গ করা হয় যথাক্রমে শামসুর রাহমান ও হাসান আজিজুল হককে। পরে গ্রন্থটি *দক্ষিণায়নের দিন* নামে একত্রে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করা হয় তিনজনকেই।

৭. আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গ্রন্থপঞ্জি

ক. ছোটগল্প

১. অন্য ঘরে অন্য স্বর : ১৯৭৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, গল্পসংখ্যা : ৬
২. খোঁয়ারি : ১৯৮২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯, গল্পসংখ্যা : ৪
৩. দুধভাতে উৎপাত : ১৯৮৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, গল্পসংখ্যা : ৪
৪. দোজখের ওম : ১৯৮৯, গল্পসংখ্যা : ৪
৫. জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল : ১৯৯৬, গল্পসংখ্যা : ৫
৬. গল্পসংগ্রহ : কলকাতা ১৯৯৩
৭. অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : ঢাকা ২০০৩, গল্পসংখ্যা : ৭
সম্পাদক : প্রশান্ত মৃধা। ভূমিকা : আনু মুহাম্মদ এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ৭টি গল্প : 'বংশধর',

'তারাদের চোখ', অতন্দ্র', 'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি', 'নিশ্বাসে যে প্রবাদ', 'চিলেকোঠায়' ও 'পরিচয়'। এ গ্রন্থে ৮টি ভাগ : গল্প, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ঘোষণাপত্র-সম্পাদকীয়-আলোচনা-বক্তব্য, কবিতা ও ছড়া, অনুবাদ, ব্যক্তিগত রচনা ও পরিশিষ্ট।

তিনটি অগ্রন্থিত গল্প সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে প্রদত্ত তথ্য :
'অতন্দ্র', *সমকাল*, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৬১/৬২, সম্পাদক : সিকান্দার আবু জাফর।
'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' *বাংলাদেশের গল্প*, সম্পদক : দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণবেশ সেন, গ্রন্থবিতান, কলকাতা।
'নিশ্বাসে যে প্রবাদ', *কণ্ঠস্বর*, প্রকাশকাল ১৯৬৫, সম্পাদক : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা।

খ. উপন্যাস

১. চিলেকোঠার সেপাই : ১৯৮৬, ঢাকা; ১৯৯৩, কলকাতা
২. খোয়াবনামা : ১৯৯৬, ঢাকা; ১৯৯৬, কলকাতা

গ. প্রবন্ধ

১. সংস্কৃতির ভাঙা সেতু : ১৯৯৭ কলকাতা; ১৯৯৮ ঢাকা

ঘ. অন্যান্য

১. চূর্ণ ভাবনা ও চূর্ণ কথা সংগ্রহ : সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র, ব্যক্তিগত ডায়েরি, স্কুলপাঠ্য রচনা
[সংকলন ও সম্পাদনা : আলাউদ্দিন মণ্ডল, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা ২০১১]

ঙ. কবিতা

১. 'লাশ', *লিরিক*: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১৯৯২, চট্টগ্রাম। সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী।

২. 'না', *লিরিক*: প্রাগুক্ত
৩. 'শোক সংবাদ', *লিরিক*: প্রাগুক্ত
৪. 'ডিসেম্বরের বেলা', *লিরিক*: প্রাগুক্ত
৫. 'স্বপ্নে আমার জন্ম', অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
৬. 'বৃষ্টির পর', অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
৭. 'হে নটরাজ এবার তোমার নাচন থামাও', অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *লিরিক*-এ (প্রাগুক্ত) দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইলিয়াস জানিয়েছেন, কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর লেখালেখির শুরু। ষাটের দশকে প্রকাশিত কবি রফিক আজাদ সম্পাদিত *স্বাক্ষর*-এর একাধিক সংখ্যায় তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে (ব্যক্তিগত আলাপ : ১০.৬.৯৬, ঢাকা)। তিনি জানিয়েছেন পরিণত বয়সেও কবিতা লিখতেন, তবে কোথাও ছাপতে দিতেন না।

চ. ছড়া

১. 'আমার রোগ', *অগ্রন্থিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*
২. 'টুম্পারানীর জন্মদিনে', অ. আ. ই.
৩. 'সর্দার আর্জান ও বাঘের কবিতা', অ. আ. ই.
৪. 'ডিসেম্বরের বেলা', অ. আ. ই.

তথ্য-সংকেত

১. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ, ৯. ৬. ১৯৯৬, ঢাকা।
২. *লিরিক*: আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা, ১৯৯২, চট্টগ্রাম। সম্পাদক : এজাজ ইউসুফী। পৃষ্ঠা-১৩১।
৩. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ : প্রাগুক্ত।
৪. *লিরিক :* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৫।
৫. *লিরিক*: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৬।
৬. *লিরিক*: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৭-৩৮।
৭. *লিরিক*: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৩৭-৩৮।
৮. *লিরিক* 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা'য় ইলিয়াসের কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। ৩৯ পঙ্‌ক্তির 'ডিসেম্বর বেলা' কবিতার (রচনাকাল ১৯৭৮) শেষ ৮ পঙ্‌ক্তি এ রকম :
'পদ্মানদীর মাঝি শ্রীচ্যুত কুবের এই জলের শ্যাওলা হয়ে ডাঙায় নেতিয়ে পড়ে রোজ

কোনো কোনো দিন খুব মাথা তুলি, একবার করে দেখি খোঁজ
তার জলে ফাঁপা সব আঙুলের ফাঁক দিয়ে তারই ধরা শাদা ইলিশেরা
কি করে গলিয়ে পড়ে কেন তার শূন্য দুই হাতে ঘরে ফেরা?
মাছ ধরা হয়ে গেলে মাছ আর তার মধ্যে কেন জোড়াহীন বিচ্ছিন্নতা?
এইসব ভেজা হাত অঙ্গুলিকে শক্ত করে দিতে চাই। অনন্তকালের সব প্রথা
ভেঙে ফেলি। উত্তরে অবসাদ। ধারালো কলমে জিভে যতো হাঁকো ডাকো—
সংঘাত স্থগিত থাক। জীবন তো একবারই। কিছুই তো করা হলো নাকো ॥'
(পৃ-২৮৩)

৯. *লিরিক :* প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা-১৪১।

১০. সালটি নির্দিষ্ট করে তিনি বলতে পারেননি। *সমকাল*-এর সেই সংখ্যাটিও জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

১১. ব্যক্তিগত আলাপ : প্রাগুক্ত এবং সাক্ষাৎকার, *লিরিক :* প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৫।

১২. *লিরিক :* প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪২।

১৩. ব্যক্তিগত আলাপ : প্রাগুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান সস্ত্রীক রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি ভ্রমণের কথা। বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সঙ্গে তিনি জড়িত, এর সঙ্গে অধ্যাপক আসহাবউদ্দিন আহমদ জড়িত ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ইলিয়াস আসহাবউদ্দিনের সঙ্গে বাঁশখালীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরেছেন। এ ছাড়া *চিলেকোঠার সেপাই* ও *খোয়াবনামা* রচনার জন্য তিনি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে চর এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন।

১৪. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ : প্রাগুক্ত।

১৫. 'একটি অবশ্যপাঠ্য উপন্যাস' : *জিজ্ঞাসা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা। পৃষ্ঠা-২৪২।

১৬. 'বদ্ধতাকে ভেঙ্গেছে মায়াবিভ্রান্ত বাস্তব' : *দেশ*, ২৬ মার্চ ১৯৯৪ কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৩৬।

১৭. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ : প্রাগুক্ত।

১৮. গ্রন্থের ফ্ল্যাপে প্রকাশকের বক্তব্য : *খোয়াবনামা*, কলকাতা সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬, প্রকাশক।

১৯. আলী আহমদ : 'কেমন আছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস?' 'জনকণ্ঠ সাময়িকী', *দৈনিক জনকণ্ঠ*: ৩.৫.১৯৯৬, ঢাকা।

২০. আলী আহমদ : প্রাগুক্ত।

২১. লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ : প্রাগুক্ত।

গ্রন্থ-প্রবন্ধ-আলোচনা-সাক্ষাৎকারপঞ্জি

আলোচিত গ্রন্থ

১. অন্য ঘরে অন্য স্বর : ১৯৭৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, গল্পসংখ্যা : ৬
২. খোঁয়ারি : ১৯৮২, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮৯, গল্পসংখ্যা : ৬
৩. দুধভাতে উৎপাত : ১৯৮৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, গল্পসংখ্যা : ৪
৩. দোজখের ওম : ১৯৮৯, গল্পসংখ্যা : ৪
৫. জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল : ১৯৯৬, গল্পসংখ্যা : ৫

সহায়ক গ্রন্থ

১. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : *বিদায়, অবন্তী!*, ১৯৯৫, ঢাকা
২. আবু হেনা মোস্তফা কামাল : *কথা ও কবিতা*, ১৯৮১, ঢাকা
৩. জীবনানন্দ দাশ : *মহাপৃথিবী*, পূর্বাশা লিঃ, ১৯৪৪, কলকাতা
৪. নাজমা জেসমিন চৌধুরী : *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, ঢাকা
৫. শামসুর রাহমান : *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, সাহিত্যপ্রকাশ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯, ঢাকা
৬. শিশিরকুমার দাশ : *বাংলা ছোটগল্প*, প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, ১৯৮৩, কলকাতা
৭. সাঈদ-উর রহমান : *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩, ঢাকা
৮. সারোয়ার জাহান : *বাংলা উপন্যাস: সেকাল-একাল*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, ঢাকা
৯. হাসান আজিজুল হক : *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪, ঢাকা

সহায়ক প্রবন্ধ-আলোচনা-সাক্ষাৎকার

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : 'বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?' *অমৃতলোক* ৬৯, শারদ ১৪০০, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

২. আবুল বাশার : 'বদ্ধতাকে ভেঙেছে মায়াবিভ্রান্ত বাস্তব', *দেশ*, ২৬ মার্চ, ১৯৯৪, কলকাতা

৩. আলী আহমদ : 'কেমন আছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস?' 'জনকণ্ঠ সাময়িকী', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩ মে ১৯৯৬, ঢাকা

৪. আহমদ কবির : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর: বিষয় ও প্রকরণ: প্রসঙ্গ ছোটগল্প', *একুশের প্রবন্ধ '৮৮*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, ঢাকা

৫. ইফতেখারুল ইসলাম : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুধভাতে উৎপাত', *নিরন্তর*, আষাঢ় ১৩৯৪, ঢাকা

৬. ফারুক সিদ্দিকী : 'শওকত আলী : ভগ্ন চিত্রকল্প ও "লেলিহান সাধ" গল্পগ্রন্থ', *নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা, মার্চ ১৯৯২, বগুড়া

৭. বিশ্বজিৎ ঘোষ : 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ: ছোটগল্প', *বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ*, ১৪০০ সাল, নারায়ণগঞ্জ

৮. মোহাম্মদ কামাল : 'হাসান আজিজুল হক: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও রচনাপঞ্জী' *বিজ্ঞাপনপর্ব*, 'হাসান আজিজুল হক সংখ্যা', শ্রাবণ ১৩৯৫, কলকাতা

৯. মোস্তফা হোসেইন : 'শতবর্ষের লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা ও সংকলন', *জীবনানন্দ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৫, ঢাকা

১০. শাহাদুজ্জামান : 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে', *লিরিক*: 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা', বৈশাখ ১৩৯৯, চট্টগ্রাম

১১. শিবনারায়ণ রায় : 'একটি অবশ্যপাঠ্য উপন্যাস', *জিজ্ঞাসা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০২, কলকাতা

১২. সুশান্ত মজুমদার : 'বাংলাদেশের ছোটগল্প: সাফল্য ও সম্ভাবনা', *মাটি*, গল্প সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, ঢাকা

১৩. হাসান আজিজুল হক : 'শওকত আলী বন্ধুবরেষু', *নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা, মার্চ ১৯৯২, বগুড়া

১৪. হায়াৎ মামুদ : 'চক্ষুষ্মান তীরন্দাজ', *কায়েস আহমেদ: নিরাবেগ বোঝাপড়া*, ১৯৯৪, ঢাকা।

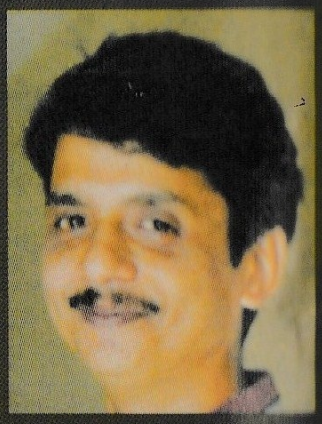

আলোকচিত্র : খালেদ সরকার

জাফর আহমদ রাশেদ

জন্ম ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০, খান্তগীর পাড়া, সুচক্রদণ্ডী, পটিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তিনটি কবিতার বই: *কাচের চুড়ি বালির পাহাড়* (১৯৯৭), যজ্ঞযাত্রাকালে (২০০১) ও দোনামোনা (২০১০)। ছোটকাগজ সম্পাদনা : আড্ডারু (চট্টগ্রাম)। পেশায় সংবাদপত্রকর্মী—প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক।

z_a_ rashed@yahoo. com

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা